উত্তম পুরুষ

তুলি-কলম

৫৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২

আমার যে উপন্যাসটি 'মুক্তিস্নান' নাম দিয়ে একটি মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তারই নতুন নামকরণ হল 'বাসর'।

নবাবী আমলের একটি জীর্ণপ্রায় রহস্যময় জমিদার বাড়ি এই উপন্যাসের পটভূমি হলেও আধুনিক কালের মানব-মানবীর আনন্দ-বেদনাকে কেন্দ্র করেই এর কাহিনীর বিস্তার ও পরিনতি।

খ্যাতিমান সাংবাদিক ও কথাশিল্পী

দক্ষিণারঞ্জন বসু

অগ্রজপ্রতিমেষু

॥ ১ ॥

মস্ত চওড়া সড়ক।

শোনা যায়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে গো-শকটে রাজস্ব বোঝাই করে এই সড়ক ধরেই চলাফেরা করত কোম্পানীর লোকেরা। তারও আগে এই সড়কের ধুলো উড়িয়েই বিদ্যুৎ গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আসত মারাঠা বর্গীর দল। তাদের উচ্চকণ্ঠে হর-হর-মহাদেও ধ্বনিতে মুহূর্তে অর্গলবন্ধ হত বাংলার পল্লী ও শহরের প্রতিটি গৃহপ্রাঙ্গণ। তাদের নামমাত্র শুনে সভয়ে চোখ বুঁজত মায়ের কোলের দামাল ছেলে। আজ সে রাস্তায় সকাল-সন্ধ্যেয় চলে প্রাইভেট কোম্পানীর ঝর্‌ঝরে্‌ বাস। কখনো বা মাল-বোঝাই লরী। কদাচিত কখনো ধুলো উড়িয়ে ছুটে যায় কোন সৌখীন ট্যুরিস্টের ঝকঝকে দামী গাড়ি।

তেমনি একখানা ঝকঝকে দামী গাড়িতে চলেছে সুমিতা সেই মস্ত চওড়া সড়ক ধরে। গাড়ি অবশ্য সুমিতার নিজের নয়, রাজা-বাহাদুরের। আর রাজাবাহাদুর মানে অবশ্য বার্ষিক পাঁচ লাখ টাকা আয়ের এক জমিদার-তনয়। অবশ্য সে জমিদারীও আজ নেই। নতুন সরকারী কানুনের এক খোঁচায় ধূলিসাৎ হয়েছে পাঁচ পুরুষের জমিদারী আর রাজাবাহাদুর খেতাব। তবু অভ্যাসবশে তল্লাটের লোকের মুখে আজও চলে রাজাবাহাদুর ডাক। আজও পাঁচ পুরুষ আগে গড়া এই বাড়ির নাম রাজবাড়ি।

সুমিতার গন্তব্যস্থান রাজবাড়ি। সে অবশ্য রাজকন্যা নয়। আর রাজরাণী হবার স্বপ্নও দেখে না।

কথাটা মনে হতেই ঠোঁটের কোণে মিষ্টি একটু হাসি খেলে গেল সুমিতার।

মাত্র দুদিন আগের কথা।

ঢং ঢং করে স্কুলের শেষ ঘণ্টা বেজে গেল। মেয়েদের দৈনিক টাস্কের খাতাগুলো হাত-ব্যাগটায় ভরে নিয়ে ক্লান্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল সুমিতা। পিছন থেকে ডাকল থার্ড টিচার রমা। অফিস-ঘর বেরিয়ে এসে ওর হাতে একখানা খামের চিঠি দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, খামের নিচে বাঁদিকে দেখছি লাল রঙে 'এম্‌বস' করে লেখা 'রাজবাড়ি'। কি ব্যাপার মিস রায়, হঠাৎ রাজপুত্তুর পাকড়াও করলেন নাকি?

খামখানা এক নজর দেখে নিয়ে ম্লান হেসে সুমিতা বলেছিল, গল্পকথায় শুনেছি বটে রাজপুত্রের রথ-চৌদল হঠাৎ এসে থামল এক দিন ঘুঁটেকুড়ুনির ভাঙা কুড়ের দুয়ারে। কিন্তু হায় রমাদি, সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। চিঠিতে রাজবাড়ি লেখা থাকলেও মাষ্টারণীর কাছে যখন এসেছে তখন মাষ্টারির পরোয়ানা নিয়েই এসেছে, ঢেঁকি কি আর স্বর্গে গেলেই গান গায় রমাদি? ধানই বানে।

রমাদি প্রশ্ন করেছিল, কথায় আপনার সঙ্গে পারব এত বিদ্যে আমার নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কি মিস রায়, খুলেই বলুন না? অবশ্যি তার আগে চিঠিখানা খুলুন।

খামখানা ছিঁড়তে ছিঁড়তেই সুমিতা বলছিল, চিঠি না খুলেই ওর ভিতরের কথা আমি বলতে পারি রমাদি। রাজাবাহাদুরের একমাত্র কন্যার রেসিডেন্সিয়াল টিউটরের নিয়োগপত্র—এসেছে মিস সুমিতা রায়ের নামে।

—তার মানে, আপনি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন?

—তাই তো মনে করছি।

—স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাবেন গার্জেন টিউটর হয়ে? কি লাভ তাতে?

—লাভ কি হবে জানি না রমাদি, ভেবেও দেখিনি। তবে ভারি কৌতূহল হয়েছে মনে, তাই যাব।

নিচের ঠোঁটটা একটু বাঁকিয়ে রমা প্রশ্ন করেছিল, কৌতূলহটা কার জন্যে? রাজাবাহাদুরের?

সুমিতা মুখটা চকিতে তুলে জবাব দিয়েছিল, স্কুল মাষ্টারণীর পক্ষে সেটা খুব বাড়াবাড়ি হয় নাকি রমাদি? চাঁদে হাত দেবার সাধ আমার সেই। আসলে আমার কৌতূহলটা পিসিমার জন্যে।

—পিসিমা আবার কে?

—তা জানি না। চাকরির দরখাস্তের জবাবে যে চিঠিখানা এর আগে আমি পেয়েছি তারও মাথায় লাল রঙে এম্‌বস্ করা ছিল 'রাজবাড়ি,' কিন্তু চিঠিখানা আগাগাড়া গোটা গোটা মেয়েলি হাতে লেখা। নিচে কোন স্বাক্ষর নেই। শুধু লেখা 'শুভার্থিনী পিসিমা'। সেই চিঠি পেয়ে অবধি কৌতূহলের আমার অবধি নেই। আজ নিয়োগপত্র পেলাম। কালই এখান থেকে আমার ছুটি।

হঠাৎ ব্রেক কসে মোটর ডাইনে মোড় ঘুরলো। চমকে বাইরে তাকালো সুমিতা। বড় রাস্তা ছেড়ে গাড়ি একটা লাল শুরকি-ঢালা পথে পড়েছে।

সুমিতা শুধাল, আমরা কি এসে গেলাম?

ড্রাইভার বা'হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে ডান হাতে সামনের দিকে ইশারা করে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই যে রাজবাড়ি দেখা যাচ্ছে। এ রাস্তাটা রাজাবাহাদুরের নিজের এলাকা। সরকারী নয়।

সামনে চোখ ফেরাল সুমিতা। আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে বিরাট রাজবাড়ি। বড় বাড়ি, বিরাট

অট্টালিকা সুমিতা অনেক দেখেছে। কিন্তু এখানে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে শুধু মাঠের পর মাঠ। মাঝে মাঝে গাছ-গাছালির ছোট ছোট ঝোঁপ-জঙ্গল। তার মাঝখানে হঠাৎ এত বড় একটা অট্টালিকা যেন পরম বিস্ময়ের মত দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু সুমিতার বিস্ময়ের তখনও অনেক বাকি।

মোটর এসে থামল রাজবাড়ির ফটকে। গাড়ি থেকে নেমে আর একবার বাড়িটার দিকে চাইল সুমিতা। সাদা রঙের তেতলা বাড়ি। বেশ পুরনো। অনেক দিন হয়তো শ্রী ফেরানো হয় না। তবু দেওয়ালের গায়ে স্যাঁতা পড়েনি কোথাও। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বট-পাকুড়ের সবুজ পাতা ইসারায় বলছে বর্তমান গৃহকর্তার উদাসীন-তার কথা। কার্নিসের ফাঁকে ফাঁকে পায়রা-বাদুড়ের স্থায়ী আস্তানা যেন ঘোষণা করছে এ বাড়ির মানুষ অধিবাসীদের পশ্চাদপসরনের কাহিনী।

ফটকে মস্ত বড় কাঠের দরজা। আগাগোড়া চোখুপি করে কাঠের বাতা লাগানো। প্রতিটি জয়েন্টে চওড়া টুপি পরানো লোহার গজাল পিটিয়ে বসানো। যেমন শক্ত, তেমনি মজবুত। যেন কোন দুর্ভেদ্য দুর্গের দ্বারপথ।

সেই পথ অতি অনায়াসে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করল সুমিতা। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল রাজবাড়ির পুরনো চাকর গদাধর।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে ঝকঝকে দেয়ালটায় একবার আলতো করে হাত বুলিয়ে নিল সুমিতা। যেমন পালিশ তেমনি ঠাণ্ডা।

সেদিকে বুঝি চোখ পড়েছিল গদাধরের। সে বলল, এ সাধারণ চুনের কাজ নয় দিদিমণি, হাতে আপনার একটুও লাগবে না। এ সবেই পংখের কাজ। বুড়ো রাজাবাহাদুর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছিলেন দেশ বিদেশ থেকে নামকরা সব মিস্ত্রি আনিয়ে।

সুমিতা প্রশ্ন করল, তোমাদের বুড়ো রাজাবাহাদুর বুঝি খুব সৌখিন লোক ছিলেন ?

কপালে দুই হাত ঠেকিয়ে গদাধর বলল, সে সব যে কি দিনকালই ছিল দিদিমণি। কথার মাঝখানে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল গদাধর।

শ্বেত পাথরের ঝকঝকে লম্বা টানা বারান্দা পার হয়ে প্রকাণ্ড একটা হলঘরে ওরা ঢুকল। একটা নরম সিল্ক-মোড়া সোফায় সুমিতাকে বসতে বলে গদাধর অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সারা ঘরে ছড়ানো অতীত ঐশ্বর্যের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। দেয়ালে দেয়ালে সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো বড় বড় তৈলচিত্র। রাজবংশের বিভিন্ন প্রতিনিধির। বিচিত্র সাজসজ্জা। কারো হাতে বন্দুক। কারো হাতে তলোয়ার। কেউ বসে আছেন রত্নখচিত আসনে। কেউ অশ্বারূঢ়। কেউ বা সগর্বে দাঁড়িয়ে আছেন স্বহস্তে নিহত বাঘের পিঠে পা দিয়ে। তৈলচিত্রের ফাঁকে ফাঁকে বাঘ, ভালুক, হরিণের মাথা কাঠের সঙ্গে এঁটে দেয়ালের গায়ে বসানো। জমিদারবংশের বীর্য ও শৌর্যের নিশানা। একপাশে একটা আসন আগাগোড়া বাঘের চামড়ায় মোড়া। মাথায় উপরে ঝুলছে নানা আকারের অনেকগুলো ঝাড়লণ্ঠন। অপরাহ্নের মৃদু আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। কি একটা ছোট পাখি হঠাৎ উড়ে যেতে তার পাখায় লেগে টুংটাং করে বেজে উঠল একটা ঝাড়ের অনেকগুলো তিন-কোণা কাঁচের টুকরো। তাদের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে ঘরের এখানে ওখানে আলপনা আঁকল অনেলগুলো রামধনু-রং।

পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল সুমিতা। উঠে দাঁড়াল নিজের অজ্ঞাতেই। ঘরে ঢুকলেন একটি বর্ষীয়সী বিধবা। পরনে গরদের কাপড়। মাথায় ঈষৎ ঘোমটা। তাঁর বাঁ হাত ধরে ঢুকল একটি নয় দশ বছরের মেয়ে। পিছনে গদাধর।

সুমিতার বুঝতে দেরি হল না ইনিই পিসিমা। এগিয়ে হাত

বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিল। হাত দিয়ে ওর চিবুক ছুঁয়ে নিজের ঠোঁটে লাগিয়ে বিধবা বললেন, বসো মা। পথে আসতে কোন রকম কষ্ট হয়নি তো ?

সুমিতা সংক্ষেপে জবাব দিল, আজ্ঞে না।

গদাধর একটা বেতের চেয়ার এগিয়ে দিল। তাইতে বসতে বসতে পিসিমা বললেন, তোমার নতুন মাসিমাকে প্রণাম কর ইন্দ্রাণী।

মেয়েটি এগিয়ে এসে প্রণাম করল। সুমিতা দুই হাত বাড়িয়ে তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, ইন্দ্রাণী! বেশ নাম।

পিসিমা মৃদু হেসে হেসে বললেন, বাড়িতে আমরা রাণী বলেই ডাকি। বুঝতেই পারছ মা, ওই তোমার ছাত্রী। শুধু ছাত্রী নয়, ও তোমার মেয়ের মতোই। ওর সব দায়িত্বই তোমাকে নিতে হবে।

কথাটা শুনেই হঠাৎ চমকে উঠলো সুমিতা। সব দায়িত্ব। একটি কচি মেয়েকে মানুষ করবার দায়িত্ব। সে যে গুরু দায়িত্ব। সে দায়িত্ব বইবার শক্তি কি তার আছে ?

পিসিমার দিকে একবার চেয়ে মুখ নিচু করে সুমিতা বলল, আমার সাধ্যমত আমি চেষ্টা করব। জানি না আপনাদের এত বড় বিশ্বাসের মর্যাদা আমার দ্বারা রক্ষা হবে কি না।

প্রত্যেকটা কথার উপর জোর দিয়ে পিসিমা ধীর গলায় বললেন, দেখ মা, এ রাজবাড়ির মালিক সর্বেশ্বরের বাবা ছিলেন আমার দূর সম্পর্কের ভাই। কিন্তু সর্বেশ্বর আমাকে নিজের মায়ের মতই সম্মান করে, ভালবাসে। আর সেই জোরেই এত বড় রাজবাড়ির সব ভার সব কাজ এতকাল আমার হাতেই চলে এসেছে। তার ফলে আর কিছু শিখি না শিখি, মানুষ চিনবার শিক্ষা আমার হয়েছে। তোমার ছোট্ট চিঠিখানি পড়েই কেন যেন আমার মনে হয়েছিল, তোমাকেই আমার চাই। তুমিই পারবে। আর আজ এই সামান্য ক্ষণ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি, লোক চিনতে আমার ভুল হয় নি।

এত বড় বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই এতখানি প্রসংশা পাবার জন্য প্রস্তুত ছিল না সুমিতা। একরকম ঝোঁকের মাথায় এ চাকরি ও গ্রহণ করেছিল। তার সঙ্গে মিশে ছিল কিছুটা কৌতূহল। চিঠির খামের উপর এম্‌বস্‌ করা রাজবাড়ি কথাটা, চিঠির নিচে স্বাক্ষরের পরিবর্তে পিসিমা লেখাটাই ওর মনকে এখানকার সম্বন্ধে কৌতূহলী করে তুলেছিল। মনে মনে ভেবেছিল, স্কুল-মাষ্টারি তো হাতের পাঁচ রইলোই। যখন হয় একটা জুটিয়ে নেওয়া যাবে। দেখাই যাক না রাজবাড়ির চেহারাখানা কেমন। কেমন সেখানকার মানুষগুলো। একটা নতুন অভিজ্ঞতাও তো হবে। ছোটবেলায় বাপ-মা হারিয়ে মানুষ হয়েছিল স্বল্পবিত্ত কাকার সংসারে। সারা জীবন অভাব-অনটন দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে শুধু। তাই ওর মনে কৌতূহল হয়েছিল রাজবাড়ির স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্যকে সামনাসামনি জানবার।

অবশ্য সেই সঙ্গে কিছুটা অবহেলা ও উপেক্ষার আশংকাও যে মিশে না ছিল তা নয়। তবু মনে মনে সেটুকুর জন্য প্রস্তুত হয়েই ও এসেছিল। কিন্তু এখানে প্রথম পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই যে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করল, তাতে সুমিতা সত্যি সত্যি খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়ল।

কেমম যেন যন্ত্রচালিতের মত পিসিমাকে আর একবার প্রণাম করে আবেগভরা গলায় বলল, আপনি আশীর্বাদ করুন। আপনার এই স্নেহের মর্যাদা যেন আমি রাখতে পারি।

॥ ২ ॥

বালিগঞ্জে বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ সোমের বাড়ি। বিরাট কম্পাউণ্ড। ছোট বড় নানারকম গাছের সারি দিয়ে ঘেরা। তারপর সমান করে ছাটা সবুজ ঘাসের 'লন' চারিদিকে। মাঝখানে গাড়ি-বারান্দাওলা আধুনিক প্যাটার্ণের বাড়ি! সিঁড়িতে পা দেবার আগেই চোখে পড়বে একপাশে ঘাসের বুকে দাঁড়িয়ে আছে সাঁচির অনুকরণে তৈরী নকল স্তূপ একটা। আর একপাশে একটা নকল পাহাড়ের ইশারা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে শ্বেত পাথরের বারান্দাটা পার হলেই আধুনিক কেতায় সাজানো ড্রয়িংরুম।

সেদিন সন্ধ্যায় ড্রয়িংরুম তখন সরগরম। মিঃ সোমের তৃতীয়া কন্যা মিস কণিকা সোমকে ঘিরে জমে উঠেছে সান্ধ্য আসর।

সদ্য বিলেত ফেরৎ তরুণ ব্যারিস্টার তপন পুরকায়স্থ দুই ঠোঁটের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেটটা নাচাতে নাচাতে বলল, বাই জোভ মিস সোম, আপনাকে যেদিন মিঃ মালহোত্রার গার্ডেন পার্টিতে প্রথম দেখলাম সেদিন তো আমি রীতিমত চমকে উঠেছিলাম।

অনেকগুলো জিজ্ঞাসু চোখ একসঙ্গে ঘাড় ফেরাল তপনের দিকে।

কাঁধ দুটোকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে ঠোঁটের সিগারেটটা হাতে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তপন বলল, আমি তো সেদিন ভেবেই পাই নি যে, মাত্র একমাস আগে যে অপরূপাকে দেখে এলাম ইংলণ্ডের সমুদ্র সৈকতে, তাকেই আবার কেমন করে দেখতে পেলাম কলকাতার সেই অভিজাত আসরে!

কৌতুকে নেচে উঠল মিস কণিকা সোমের সুর্মা-আঁকা দুটি চোখ। হেসে বলল, আপনার কথাগুলো শুনে আমার অবশ্য খুশি হওয়াই উচিত ছিল মিঃ পুরকায়স্থ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত বিলেতের মাটিতে আমার পা-ই পড়েনি। আপনি হয়তো আর কাউকে দেখে থাকবেন—অপর কোন মনোরঞ্জনীকে।

—আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না মিস সোম, আপনার অকারণ স্তুতিগান করতে আমি চাইনি। আপনি যে কখনো বিলেত যাননি সে খবরটুকু আমি সেই গার্ডেন পার্টিতেই জোগাড় করি। এবং আরো জানতে পারি যে বিলেতের সৈকতে যাকে আমি দেখেছিলাম তিনি আপনারই বড় বোন—বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে গেছেন কন্টিনেণ্ট ট্যুরে। বলুন তো, আমার এ সব তথ্য সত্য কি না?

একটু যেন লজ্জিত হল কণিকা। নিচের ঠোঁটটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে হাসির মুখোস মুখে টেনে বলল, আপনি যা যা বললেন তার সবই সত্যি। তাছাড়া সবাই বলে দিদির চেহারার সঙ্গে আমার নাকি আশ্চর্য মিল। কাজেই দুজনকে এক বলে ভুল করা আপনার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। সত্যি মিঃ পুরকায়স্থ, আমার ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত। প্লিজ—

মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে এগিয়ে এল তপন। কণিকার দুটি হাতকে নিজের মুঠোয় নিয়ে বলে উঠল, প্লিজ—প্লিজ—প্লিজ। কোন রকম ক্ষমার কথা নয়। সে আপনার মুখে মানাবে না। জানেন মিস সোম, আমি খুব কন্‌ফিডেণ্ট্‌লি বিশ্বাস করি যে কতকগুলি মুখের জন্মই হয় রাণীর মুকুট পরবার জন্য। আপনি এই পৃথিবীর সেই দুর্লভতমাদের অন্যতমা।

মেঘ কেটে গেল। খুসির আলোয় দিগন্ত উদ্ভাসিত করে হেসে উঠল কণিকা। বলল, থ্যাঙ্কস্ ফর ইয়োর কম্‌প্লিমেণ্টস্।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে নিঃশব্দে দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল

একটি সুদর্শন পুরুষ। পরনে দেশী পোযাক—ধুতি, পাঞ্জাবী ও সাদা সোয়েডের আলবার্ট জুতো। কাঁধে পাট করা গরদের চাদর।

আগন্তককে দেখে সবাই একসঙ্গে স্বাগত জানাল, আসুন—আসুন—

আগন্তকের বয়স ত্রিশের ঘরে। কিন্তু দেখতে আরো অল্প বলে মনে হয়। শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা। সুগঠিত চোখ মুখ নাক। এক কথায় সুন্দর সুদর্শন। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, যুবকের ইতস্তত দৃষ্টিপাত ও দ্রুতলয় কথোপকথনের ভিতর দিয়ে এমন একটা অস্থিরচিত্ততার প্রকাশ রয়েছে যা তার চেহারার সঙ্গে ঠিক মানায় না! মনে হয় স্বভাবতঃ আত্মস্থ এই লোকটি যেন অন্তরের কি এক তুর্নিরীক্ষ্য তাড়নায় অবিরাম মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে।

কণিকা ও তপনকে সেই অবস্থায় দেখেই আগন্তক থমকে দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্য কুটিল হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি। কঠিন হয়ে উঠল তুটি চোয়াল।

কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। তারপরই সহজ হয়ে এল তার দৃষ্টি—তার চোখ মুখ।

হাসিমুখে এগিয়ে এসে একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল, তারপর—আপনাদের সব খবর ভাল তো?

একজন বলল, ভাল আর কই তেমন? আজ কদিন আপনার দেখা নেই। তাই আমাদের আসরও ঝিমিয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মিস্ সোম তো বড়ই মনমরা হয়ে আছেন।

বাঁকা চোখে কণিকার দিকে একটু তাকিয়ে আগন্তক বলল, ঘরে ঢুকে কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখলাম না মিঃ সিংহ। বরং মিস্ সোমকে বেশ খুশমেজাজ বলেই তো মনে হল।

কথাটার মধ্যে যে একটা চাপা ব্যঙ্গ আছে সেটা উপলব্ধি করে

সবাই চুপ করে গেল। কলগুঞ্জনমুখর ড্রয়িংরুমটা হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। কথাগুলো শোনামাত্রই কণিকার চোখদুটি রোষকুটিল হয়ে উঠেছিল। আশ্চর্য শক্তিতে সে রাগকে সংযত করে সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এক মিনিট। আমি আসছি।

বলতে বলতেই ঘর ছেড়ে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল কণিকা। স্তব্ধ ঘর স্তব্ধতর হয়ে উঠল।

ঘরের হাওয়াটাকে পাল্টাবার জন্য মিসেস্ সিংহ বলল, তারপর মিঃ রায়, আমাদের সেই আউটিং-টার কি করলেন? আপনার রাজবাড়িতে একটা মধ্যযুগীয় এ্যাটমস্‌ফিয়ারের মধ্যে আমরা সবাই মিলিত হব। উঃ! ভাবতেও আমার কেমন থ্রিল হচ্ছে!

আগন্তুক ঠাণ্ডা গলায় বলল, বেশ তো, যবে আপনাদের সময় হবে বলবেন, আমার একদা রাজবাড়ির ভাঙা দরজা আপনাদের জন্য সব সময়ই খোলা আছে।

মুখের সিগারেটটা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এসে তপন বলল, ব্যাপার কি মিঃ রায়, আপনাকে আজ বড্ডো আউট অব মুড বলে মনে হচ্ছে?

আগন্তুক মুখ তুলে সহজভাবে জবাব দিল, কই না তো। আমার মনে হচ্ছে, আমি বেশ সহজই রয়েছি।

তপন এবার ঠোঁট বাঁকা করে বলল, কিন্তু যাই বলুন মিঃ রায়, সকলের সামনে মিস্ সোমের সম্পর্কে ও রকম মন্তব্য করা আপনার উচিত হয় নি। উনি খুব উণ্ডেড হয়েছেন আপনার কথায়।

আগন্তুক সহজভাবেই জবাব দিল, আহত উনি হয়েছেন সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কেন যে হয়েছেন সেইটেই ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ পুরকায়স্থ।

—দেখুন মিঃ রায়, মেয়েদের মন একটু সেন্টিমেন্টাল, তাই—

বাধা দিল আগন্তুক। বলল, সেন্টিমেণ্ট জিনিষটা তো মেয়েদের

একচেটে নয়। পুরুষ মানুষেরও তো তাতে অধিকার আছে।

একটু 'স্রাগ' করে তপন বলল, তাহলে আপনার সেন্টিমেন্টেও উনি আঘাত দিয়েছেন, এই কথাই কি আপনি বলতে চান ?

আলোচনার গতিটা ব্যক্তিজীবনের রন্ধ্রপথে প্রবেশ করছে দেখে আগন্তুক এবার বিরক্ত হয়ে উঠল। সে বিরক্তি প্রকাশ করেই বলে উঠল, বলতে আমি কিছুই চাই না। তাছাড়া, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কোনরকম আলোচনা করতেও আমি নারাজ। দয়া করে আপনার নিজের কাজে মন দিন।

তপন বুদ্ধিমান ছেলে। আগন্তুকের ব্যথাটা যে কোথায় তা সে ভাল করেই বোঝে। আর সেই কারণেই সে ব্যথাটাকে নিয়ে খেলা করতেই তার আনন্দ। সে জানে এই খেলার জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভর করছে তার জীবনের ভবিষ্যৎ। আগন্তুক এই সোম-পরিবারের অনেক দিনের বন্ধু। সোম-কন্যা মিস কনিকার সঙ্গে এর সম্ভাব্য পরিণয়ের কথাও লোকের মুখে মুখে অনেক দূর ছড়িয়েছে। বিয়ে এতদিন হয়তো হয়েও যেত। শুধু এই আগন্তুকের একটা রহস্যময় মানসিক অনিশ্চয়তাই বিয়ের তারিখটাকে দিন থেকে দিনান্তরে ঠেলে নিয়ে এসেছে।

এসব খবর তপনের জানা। তবু সদ্য বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার মিঃ তপন পুরকায়স্থ সোম-কন্যা কণিকার চম্পক অঙ্গুলির 'ক্যাপস্টান'-এর সঙ্গেই তার জীবন-তরণী বেঁধে নিতে সচেষ্ট হয়েছে। কারণ সে ভালভাবেই জানে যে, পাঁচ বছর আগে অবস্থা যাই থাকুক, আজ জমিদারী ব্যবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের মোড় যেভাবে ঘুরেছে তাতে হাওয়া এখন আগন্তুকের চেয়ে তার অনুকূলেই বইতে সুরু করবে। আর সেই হাওয়ার পাল তুলে দিয়ে কন্যার হাত ধরে একবার বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ সোমের ওকালতীর গদী পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে তবেই তার ব্যারিস্টার জীবনের মোক্ষলাভ সম্ভব।

অন্যথায় হাইকোর্টের লাল দালানের উঁচু চূড়ার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখের পাতাই জ্বালা করবে, তার ভিতরে ঢুকবার রূপোলি পথে কোনদিনই পড়বে না তার পা।

সেই সম্ভাবনাকে বুকের মধ্যে সযত্নে লালন করতে করতেই তপন মিষ্টি মিষ্টি হাসতে হাসতে আগন্তুকের কথার জবাব দিল, দেখুন মিঃ রায়, আপনার পল্লীগ্রামের জমিদারী সমাজের কনজারভেটিজম থেকে এখানকার আধুনিক সোসাইটির মুক্ত জীবনের পথের মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক, সে কথাটা আপনি এত সহজে ভুলে যান কেমন করে? একটি মেয়ের সঙ্গে একদিন আপনার বিয়ের কানাঘুষা কথা হয়েছিল বলেই যে সে অসূর্যম্পশ্যা জমিদার-বধূর মত আর কারো সঙ্গে হেসে একটা কথাও বলতে পারবে না, এ আপনার অন্যায় আব্দার।

এই অপ্রীতিকর আলোচনায় যোগ দিতে একান্তই অনিচ্ছুক ছিল বলেই আগন্তুক তপনের এতগুলো কথাকে নীরবেই হজম করে যাচ্ছিল। কিন্তু যখন সে বুঝল যে তপন ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গটাকে শেষ হতে দিচ্ছে না, তখন বাধ্য হয়ে তার মুখ বন্ধ করবার জন্য আগন্তুক বললো, দেখুন মিঃ পুরকায়স্থ, আপনি আমারও গার্জেন নন, এ সোমবাড়িরও নন, কাজেই এ বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে কোন কথা আমি বলতে চাই না। আপনি চুপ করুন।

তপন বুঝল, ঠাঁই এবার কঠিনরূপ ধারণ করেছে। অতএব সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে সে বলল, বেশ, আপনি যখন বলছেন আমি চুপ করলাম। কিন্তু ঠিক জানবেন মিঃ রায়, আমি চুপ করে থাকলেই নেচার্স কোর্স উইল নট স্টপ্।

বলেই সে দরজা পুশ করে বাগানের দিকে পা বাড়াল।

এরপর আর আসর জমতে পারে না। একে একে সবাই যে যার

কাজে সরে পড়ল। শুধু দুই হাতের উপর মাথা রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল আগন্তুক।

ঘরে ঢুকল কণিকা। খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আগন্তুকের দিকে চেয়ে। তারপর কাছে এসে বলল, তুমি একা বসে আছ?

মাথা তুলে আগন্তুক খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি যে সব সময়ই একা, সে কি তুমি আজও জান না কণিকা?

তার পাশে বসে কণিকা বলল, কিন্তু সর্বেশ্বর, কেন তুমি এমন একা একা লুকিয়ে থাক? কেন তুমি আমাকে তোমার মনের কাছে যেতে দাও না?

হঠাৎ যেন আগুন লাগল শুকনো পাতায়। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সর্বেশ্বর বলে উঠল, মনের মানুষ তো খুঁজে পেয়েইছ। সেখানেই সরে বসো গে।

ছিটকে উঠে দাঁড়াল কণিকা। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তার মানে? তুমি কি বলতে চাও?

—আমি কি বলতে চাই সেটা তুমি ভালই জান। তবু আমার মুখ থেকেই যখন শুনতে চাইছ তখন শোন। কিছুদিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি, তোমাদের বাড়ির সবাই যেন আমার প্রতি একটু বিরূপ হয়ে উঠেছে। তোমার বাবা তো আজকাল—

বাধা দিল কণিকা, আমার বাবার কথা থাক। তার কি বলবে তাই বল।

—না। তোমার বাবাকে বাদ দিয়ে আমার কথা হয় না। তিনিই আমাকে একদিন আদর করে ডেকে এনেছিলেন এই বাড়িতে। হয়তো তার ছোট মেয়ের সংগে বিয়ে দেবার বাসনাই ছিল তাঁর মনে।

—শুধু বাসনাই নয়, সে প্রস্তাবও তিনি করেছিলেন তোমার

কাছে। তুমিই নানা অজুহাত দেখিয়ে সে সম্ভাবনাকে এতদিন আটকে রেখেছ। নইলে এ বিয়ে হয়েও যেত।

—সেদিন বিয়েটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলাম বলে আজ নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে কণিকা।

—তার মানে, আমাকে বিয়ে করলে তুমি ঠকে যেতে?

—পাগল! তুমি বিখ্যাত ব্যারিস্টারের আদরিনী কন্যা, হাই সোসাইটির মক্ষিরাণী, তোমাকে বধূ হিসেবে পাওয়া তো পরম ভাগ্যের কথা। আসল ব্যাপার কি জান, পাড়া-গায়ের একটা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে সেদিন আমি যদি জিতে যেতাম, তাহলে যে আজ ঠকে যেত বেচারা তপনকুমার।

—তপনকে আবার এর মধ্যে টেনে আনছ কেন? সে তোমার চেয়ে কোন অংশে হীন নয় তা জান?

—তা আর জানি না। নইলে কি আর আমারি সামনে দাঁড়িয়ে আমার হবু পত্নীর সঙ্গে ফ্লার্ট করতে সাহস পায়।

—চুপ কর! এরকম অসভ্যের মত কথা বল না।

—ওহো! একজনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব চালিয়ে অপর জনের সঙ্গে ফ্লার্ট করাটাই বুঝি তোমাদের সভ্য সমাজের বিধি?

—যা জান না তা নিয়ে কথা বল না। আধুনিক সমাজের কতটুকু তুমি দেখেছ? কতটুকু তুমি জান? অজ পাড়াগায়ের এক জমিদার—

—আহা-হা, জমিদার আবার কে? জমিদারী তো এখন লাটে। দেখ কণিকা, আমার উপর তোমাদের এ আক্রোশের কারণ আমি বুঝি: তোমরা আমাকে মনে করেছিলে একটি হৃষ্টপুষ্ট নধর কামধেনু। তাই চেয়েছিলে গলায় লাল গামছা বেঁধে দরজায় আটকে রাখবে। আর প্রয়োজন মত দোহন করবে। সন্দেহটা ক্ষণেকের জন্য আমার মনেও উদয় হয়েছিল। তাই প্রথমটায় রাজী হতে পারি

নি তোমাদের প্রস্তাবে। তারপর এল নতুন ব্যবস্থা। জমিদারী লাটে উঠল। তালপুকুরে আর ঘটি ডোবে না। তাই ভাবলে, কেন আর এই আপদ পোষা। এ পর্যন্ত বেশ জলের মত বুঝি। কিন্তু বুঝতে পারি না তার পরের কথাটা!

অধৈর্যকণ্ঠে কণিকা বলল, কি কথা?

—আচ্ছা, আর কেউ না পারুক, তোমার সঙ্গে তো আমার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তবে তুমিও কেন পারলে না?

—কি?

—সোজা কথাটা সহজভাবে আমাকে বলে দিতে।

—কি সোজা কথা?

—সোজা কথা এই যে, তোমাকে দিয়ে আর আমাদের দরকার নেই। গলার গামছা তো খুলে দিয়েছি। এবার তুমি সরে পর। মেয়ের জন্য আমরা নতুন কামধেনুর সন্ধান পেয়েছি।

অসহ্য রাগে লাল হয়ে উঠল কণিকার শুভ্র মুখ। দাঁতে দাঁত চেপে সে শুধু বলল, ব্রুট!

হেসে উঠল সর্বেশ্বর। বলল, ঠিক বলেছ কণিকা। ওই শব্দটিই আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। আর সে পরিচয়টা আমাকে একটু তাড়াতাড়ি দিচ্ছ বলে যাবার আগে তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেলাম। বিদায়।

হাসতে হাসতে সর্বেশ্বর গেট পার হয়ে চলে গেল।

॥ ৩ ॥

সকাল বেলা।

দোতলার টানা বারান্দায় সবে সোনালি রোদ এসে পড়েছে। এর মধ্যেই সুমিতা ইন্দ্রাণীকে নিয়ে পড়াতে বসেছে। ইন্দ্রাণীর পাঠ্য তালিকার যে বন্দোবস্ত সে এখানে এসে দেখতে পেয়েছে তাতে স্পষ্টই বুঝে নিয়েছে এখানেও পিসিমার স্বাক্ষর রয়েছে। আধুনিক রুটিনবাঁধা লেখাপড়ার প্রায় সব ব্যবস্থাই রয়েছে। কিন্তু তারি সঙ্গে প্রায় সমান গুরুত্ব নিয়ে রয়েছে প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল ধারার স্পষ্ট যোগাযোগ। সংস্কৃত স্তোত্রপাঠ, উপনিষদের গল্প-কাহিনী, রামায়ণ ও মহাভারতের শিশু-সংস্করণ, এমন কি গীতার একখানি ছন্দে লেখা সচিত্র সংস্করণ।

প্রথম দিন ইন্দ্রাণীর বইগুলোর পাতা উল্টে এবং তার সঙ্গে যৎ-সামান্য আলোচনা করেই সুমিতা বুঝে নিয়েছে, শুধু রুটিন-বাঁধা ইংরেজী-বাংলা-অংক-সংস্কৃত পড়ালেই এখানে চলবে না। এই দশ বছরের মেয়ের জন্যে পিসিমা যে শিক্ষার আয়োজন করেছেন তার মূল সুরটি স্বয়ং আগে উপলব্ধি করে নিতে হবে। তারপর সেই উপলব্ধির আলোয় তাকে পথ চলতে হবে এই রাজবাড়ির অঙ্গণে।

সকাল বেলাকার পূজাপাঠ সেরে পিসিমা বেরিয়ে এলেন পাশের ঘর থেকে। পাশেই তাঁর জন্যে যে মোড়াটি রাখা ছিল তাইতে বসতে বসতে পিসিমা বললেন, তোমার ছাত্রী কেমন পড়াশুনা করছে মা? তোমার কথামত সব পড়া করছে তো ঠিক ঠিক?

একটু হেসে সুমিতা বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, রাণী বড় লক্ষ্মী মেয়ে।

ওর দিক থেকে কোন কিছুরই ত্রুটি আছে বলে তো মনে হয় না। ও যেমন বুদ্ধিমতী তেমন লক্ষ্মী। তবে—

বলতে বলতে ইচ্ছা করেই যেন থামল সুমিতা।

পিসিমা তার মুখের উপব চোখ দুটি রেখে একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, বল মা, থামলে কেন ? তোমার থাকা-খাওয়ার কোন অসুবিধা হচ্ছে কি ?

সুমিতা তাড়াতাড়ি তীব্র আপত্তি জানিয়ে বলল, আজ্ঞে, না না, আমি তো এখানে রাজার হালে আছি। তাছাড়া যে ব্যবস্থায় আপনার হাত রয়েছে তাতে কি কোন রকম অসুবিধা থাকতে পারে ? আমি বলছিলাম আমার নিজের কথা।

—কি কথা মা ?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে যেয়ে কি ভেবে সুমিতা হঠাৎ থেমে গেল। তারপর ইন্দ্রাণীর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, অনেকক্ষণ পড়া হয়েছে রাণী, এবার তুমি ভিতরে যাও। জলখাবার খেয়ে এসো।

আচ্ছা, বলে ঘাড় নেড়ে ইন্দ্রাণী টানা বারান্দা পার হয়ে ভিতরে চলে গেল। সেদিকে একটু চেয়ে থেকে পিসিমা আবার প্রশ্ন করলেন, এইবার বল মা, কি তোমার কথা।

সুমিতা বলল, কথা এমন কিছু নয়। দুটো কথা পিসিমা। একটি আমার নিজের সম্বন্ধে। গতানুগতিক ইস্কুলে পড়ে বি, এ, পাশ করেছি। তারপর মাষ্টারী করেছি গড়পড়তা আর পাঁচটা মেয়েদের স্কুলের মতই একটা স্কুলে। কিন্তু ইন্দ্রাণীর পড়াশুনার যে বন্দোবস্ত আপনি করেছেন, আর যেভাবে এতদিন আপনার কাছে ও লেখাপড়া শিখেছে, তাতে আমার আশংকা হয়েছে পিসিমা যে ওর শিক্ষার সে ধারাটি আমি অব্যাহত রাখতে পারব কি না—আমার দ্বারা ওর সত্যিকারের কোন উপকার হবে কি না।

পিসিমা চুপ করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা মা, রাণীর পড়াশুনার যে ব্যবস্থা করেছি, তোমার কি মনে হয় সেটা ঠিক নয়?

সুমিতার কথার মধ্যে যে এরকম একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল সেটা সে মোটেই ভেবে দেখে নি। তাই পিসিমার এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে সুমিতা সসংকোচে বলে উঠল, না না, পিসিমা, আপনি বিশ্বাস করুন সে সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও আমার মনে হয় নি। আমি বলছি আমার নিজের যোগ্যতার কথা।

পিসিমার মুখের উপর থেকে যেন মেঘের একখানা আবরণ সরে গেল। মৃদু হেসে বললেন, নিজের যোগ্যতার বিচারটা নিজে না করে সেটা না হয় এই পিসিমার উপরেই ছেড়ে দাও মা। এবার তোমার দ্বিতীয় কথা বল।

একটু চুপ করে থেকে সুমিতা বলল, রাণী আমার ছাত্রী। তাই ওর সব কথা আমার জানা দরকার পিসিমা, অবশ্য যতটা সম্ভব।

—বল, কি জানতে চাও, পিসিমা গম্ভীর গলায় বললেন।

—এখানে আসবার প্রথম দিনই আপনি বলেছিলেন, ওর সব ভার আমাকে নিতে হবে। সেদিন মনে করেছিলাম সেটা কথার কথা। কিন্তু এই কয়েকদিনেই বুঝতে পেরেছি, তা নয়। ওর লেখা-পড়া থেকে আরম্ভ করে খাওয়া-পরা দেখাশুনা সব ভারই আমার। তাই মনে আমার প্রশ্ন জেগেছে—

সুমিতা কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল। পিসিমা তেমনি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন, বল, কি প্রশ্ন?

—আজ্ঞে, ওর মা-বাবা কোথায়?

সুমিতার দৃষ্টি এড়াল না যে কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই পিসিমা কেমন যেন চম্‌কে উঠলেন। এত বড় ধীর স্থির গম্ভীর মানুষটিও যেন মুহূর্তের জন্য থর থর করে কেঁপে উঠলেন।

কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। আত্মসম্বরণ করতেও তাঁর বিলম্ব হল না। ধীরে ধীরে বললেন, সর্বেশ্বর এখন কলকাতায়ই বেশির ভাগ সময় থাকে। সেখানে আমাদের বাড়ি আছে। মাঝে মাঝে এখানে আসে। দু'চারদিন থেকে আবার চলে যায়। আর ওর মা? তার কথা আর কখনো তুমি জিজ্ঞেস করো না মা, সে বড় অভাগী।

বলেই পিসিমা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হয়তো দুই চোখের উদ্গত অশ্রুকে এই সদ্যপরিচিতা কন্যাসমা তরুণীটির কাছে লুকোবার জন্যেই।

ঘটনার এই আকস্মিক রূপ পরিবর্তনে সুমিতাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চুপ করে বসে রইল।

এমন সময় ঘরে ঢুকল গদাধর।

তার পায়ের শব্দেই সবার অলক্ষ্যে চোখ মুছে পিসিমা স্বাভাবিক গলায় বললেন, কি গদাধর?

গদাধর এগিয়ে এসে একখানি মুখখোলা খাম এগিয়ে দিয়ে বলল, রাজাবাহাদুরের টেলিগ্রাম এসেছে। সরকার মশাই দিলেন।

হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রাম নিতে নিতেই পিসিমা বললেন, তুমি তো জান গদাধর, কেউ তাকে রাজাবাহাদুর বলে ডাকে সেটা সর্বেশ্বরের মোটেই পছন্দ নয়। এ কথা সে তো সবাইকেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে।

মুখ নিচু করে গদাধর বলল, অনেকদিনের অভ্যাস পিসিমা, মনে থেকেও কেমন যেন ভুল হয়ে যায়।

ভাঁজ খুলে টেলিগ্রামটা পড়েই পিসিমার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, সব আসছে বিকেলের গাড়িতে। সরকার মশাইকে বলে দাও, ঠিক সময়ে ষ্টেশনে মোটর পাঠাতে।

—যে আজ্ঞে, বলে গদাধর চলে যাচ্ছিল। পিসিমা আবার কথা বললেন তাকে ডেকে, আর শোন, সর্বকে এখন থেকে শুধু 'বাবু' বলে

ডাকবে। সবাইকে তাই বলে দাও। দেখো আবার তার সামনে ভুল যেন না হয়। তাহলে আর রক্ষে রাখবে না।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে গদাধর দ্রুত পা ফেলে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিকেল বেলা।

জানলার একটা শিক ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সুমিতা।

কয়েক টুকরো পড়ন্ত রোদ পিছনের পর্দা-ঝোলানো দরজার ফাঁক দিয়ে সুমিতার চুলে, মুখে ও শাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে এলোমেলো ভাবে।

ওর মনের মধ্যেও চলেছে এলোমেলো নানান চিন্তার বিচিত্র আলপনা।

একটা ঝোঁকের মাথায় এই চাকরি নিয়ে আসবার সময় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়ে একজন সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে একটি অনাত্মীয় সম্পূর্ণ অপরিচিত জমিদার পরিবারে বাস করবার অনেক রকম অসুবিধা ও আশংকার কথা মনে হলেও এত বড় একটা গুরুতর সম্ভাবনার কথা কেন যে ঘুণাক্ষরেও তার মনে হয় নি, এ কথাটা যতবার আজ ভাবছে ততই সুমিতা যেন নিজেকে একান্ত বিব্রত ও অসহায় বোধ করছে। চাকরির নিয়োগ-পত্র পাঠিয়েছেন পিসিমা। একটি ছোট মেয়ের গৃহ শিক্ষয়িত্রীর কাজ। বাড়ির কর্তা অর্থাৎ ছাত্রীর পিতা রাজবাড়ির মালিক অর্থাৎ ধনশালী। তথাপি বাড়ির সর্বময় কর্তৃত্ব বর্ষিয়সী পিসিমার উপর ন্যস্ত। এ পর্যন্ত সুমিতা যেমন যেমনটি কল্পনা করে এসেছিল সবই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। বরং সুমিতার কপালগুণে একটু যেন বেশি করেই মিলে গেছে। এ বাড়িতে পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছে অপ্রত্যাশিত সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও সস্নেহ আহ্বান। এই কয়েকদিনেই সে বুঝতে পেরেছে,

এ বাড়িতে মানুষকে বিচার করবার কাপকাঠি আর যাই হোক কাঞ্চন-কৌলিণ্য নয়। আজ সকালেও ঘুম থেকে উঠে পূবের জানলা দিয়ে বনান্তের ওপারে ওঠা সূর্যের দিকে চেয়ে সে মনে মনে বলেছিল, হে ভগবান, এই স্নেহের আশ্রয়টি যেন আমার অক্ষুণ্ণ থাকে।

কিন্তু ঠিক তার পরক্ষণেই হোল স্বপ্নভঙ্গ। যে আশংকা গত কয়েকদিন যাবৎ শরতের শাদা মেঘের মত মাঝে মাঝে তার মনের আকাশে হাল্কা ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, একটি মাত্র প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তরের ফলেই যে তার সঙ্গে ঝড় ও মেঘের সংযোগ ঘটে এমন ভয়ংকর কালো মেঘের সূচনা করবে, এ কথা সুমিতা আগে থেকে ভাববেই বা কেমন করে?

কেমন করে ও আগে থেকেই কল্পনা করে নেবে যে রাজবাড়িতে রাণীর আসন শূন্য পড়ে আছে?

কেমন করে ও বুঝবে যে পিসিমার ছোট্ট একটি ডাকের মধ্যে দিয়ে যে অমৃতের আস্বাদনের আশায় ও অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে ছুটে এসেছিল, তার সঙ্গে মিশে রয়েছে ওর আশংকার কালকূট?

এখন কি ওর কর্তব্য? রাজাবাহাদুরকে আনতে মোটর গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন। কে জানে কেমন তাঁর প্রকৃতি? কি চরিত্রের মানুষ তিনি? একমাত্র মাতৃহীন কন্যাকে ফেলে রেখে কেন তিনি বাস করেন বিলাসবিহ্বল কলকাতা মহানগরীতে? কেন নিজ সংসার ও সম্পত্তির সর্বময় কর্তৃত্ব তিনি ছেড়ে দিয়েছেন দূরসম্পর্কিত এক বিধবা পিসিমার হাতে? হঠাৎ তিনি আসছেনই বা কেন কলকাতা ছেড়ে? তবে কি—

কথাটা মনে হতেই সুমিতার মাথার মধ্যে যেন দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। টন্ টন্ করে উঠল কপালের দুটো শিরা। মাথাটার মধ্যে যেন ঝিমঝিম করতে লাগল।

এও কি সম্ভব?

এর পিছনে কি তাহলে পিসিমার হাত আছে ?

এ কি তাঁর কোন স্নুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র-জাল ?

সংসারবিরাগী উচ্ছৃঙ্খল ভাইকে সংসারের মধ্যে ফিরিয়ে আনবার জন্য তিনি কি তাকে টোঁপ হিসাবে ব্যবহার করতে চান ? তাই কি এমন মোটা মাইনের চাকরিতে এমন অনায়াস নিয়োগ ? তাই কি অযাচিত সম্মান ও অপ্রত্যাশিত স্নেহের এই ছলনা ?

সবই মুখোস ?

আর এমনি নির্বোধ, এমনি অন্ধ সে যে এই ছলনায় মুগ্ধ হয়ে সরলা কুরঙ্গীর মত সে ব্যাধের নিষ্ঠুর বিতংসে পা বাড়িয়ে দিয়েছে ?

হঠাৎ চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। ভেসে এল মোটরের অস্পষ্ট শব্দ। চম্‌কে সামনে তাকাল স্নুমিতা। লাল স্নুরকির পথে এগিয়ে আসছে মোটর।

রাজাবাহাদুর আসছে।

কালো মোটরটা এগিয়ে আসছে একটা জন্তুর মত। তার পিছনে সরে যাচ্ছে লাল স্নুরকির পথ। যেন রক্তের ধারা পার হয়ে আসছে।

কার রক্ত ?

আতংকে হিম হয়ে গেল বুঝি স্নুমিতার বুকের সব রক্ত।

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে স্নুমিতা জানলার শিকেই মাথাটা রাখল।

নিচে রাজবাড়ির গেটের সামনে এসে জোরে হর্ন বাজাল কালো মোটরটা। মন্ত্রচালিতের মত চোখের পাতা খুলে নিচে তাকাল স্নুমিতা।

কালো মোটরের ভিতর থেকে রাজাবাহাদুর নামল।

আর একবার চম্‌কে উঠল স্নুমিতা। অজ্ঞাতেই বুঝি স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলল একটা। না, 'প্রডিগ্যাল সান' নয়। জমিদারের হৃতসর্বস্ব উচ্ছৃঙ্খল বংশধর নয়। রাজাবাহাদুর নয়।

কালো মোটরের ভিতর থেকে নামল সর্বেশ্বরবাবু। একমাথা কোকড়ানো চুল। পরনে সাদা পাঞ্জাবী। সাদা জুতো।

সুমিতার চোখের সামনে থেকে সরে গেল কালো মেঘ। হলো এক শুভ্র আবির্ভাব।

জানলার শিকটাকে শক্ত করে আকড়ে ধরে সুমিতা আবার চোখ বুঁজল।

৪

সারা বিকেলটা নিজের ঘরেই গুম হয়ে বসে রইল সুমিতা।

কি এখন করবে ও, কি করা উচিত, কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারল না। একবার মনে করল, কালই চলে যাবে এখান থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে। এ ষড়যন্ত্র-জালের মধ্যে নিজেকে আর জড়িয়ে পড়তে দেবে না।

আবার ভাবল, কিন্তু এ সব আশংকা অমূলকও তো হতে পারে। হতে পারে রজ্জুতে সর্পভ্রম। হয়তো পিসিমার সস্নেহ সদয় ব্যবহারের প্রতি ওর এই সন্দেহ একান্তই অকারণ।

তাছাড়া, এখান থেকে হঠাৎ এমন হুট্ করে চলে যাওয়া সামাজিক সৌজন্যের দিক থেকেও অত্যন্ত অশোভন। রাজাবাহাদুরই বা কি মনে করবেন? এ অবস্থায় চলে গেলে তাঁর আসার সঙ্গে নিজের চলে যাওয়ার একটা নিগূঢ় সম্পর্ক যে সকলেরই নজরে পড়বে এ কথা ভেবে সুমিতারই যেন কেমন লজ্জা করতে লাগল।

না না, সে হয় না। এভাবে এখুনি তার যাওয়া চলে না। ধৈর্য ধরে আরো কিছুদিন তাকে এখানে থাকতেই হবে। সচেতন ভাবে দেখতে হবে এঁদের আচার ব্যবহারের ধারা। সতর্ক বিচার-বুদ্ধির কষ্টি-পাথরে যাচাই করে নিতে হবে। না না, কারো প্রতি সে অবিচার করবে না। আবার কেউ তার প্রতি অবিচার করবে—তাও সে সহ্য করবে না। সে বড় হয়েছে। লেখাপড়া শিখেছে। নিজের পায়ে ভর দিয়ে জীবনের পথে মাথা উচু করে চলবার শিক্ষা সে পেয়েছে। তবে তার কিসের ভয়? কিসের আশংকা?

সন্ধ্যার পরে ঘরে এল গদাধর।

ঘরের এককোণে টেবিলের উপরে রাখা সেজ-বাতিটা জ্বালিয়ে দিতে দিতে বলল, পিসিমা আপনাকে একবার ডেকেছেন।

মুখ তুলে তার দিকে একবার চেয়ে সুমিতা বলল, তিনি কোথায় আছেন ?

—আজ্ঞে, ওপাশের পাথরের বারান্দায়। সবাই আছেন সেখানে।

সবাই! কথাটা কাণে যেতেই সহসা আবার শক্ত হয়ে উঠল সুমিতার মন। কেন? সে সবাইর মজলিসে আমাকে ডেকে পাঠানো কেন ?

তোমাদের ঘর-সংসার, তোমাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ নিয়ে তোমরা থাক। আমি তো সেখানকার অংশীদার নই। আমি শিক্ষয়ত্রী। দুদিনের অতিথি। আমাকে তার মধ্যে ডাক দেওয়া কেন ? কোন্ প্রয়োজনে ?

পরক্ষণেই একটু স্মিত হাসির রেখা খেলে গেল সুমিতার মুখের উপর দিয়ে। নিজের মনেই বুঝি সে হাসল একটু। এ কী অকারণ দুশ্চিন্তার ভূত তাকে পেয়ে বসেছে। পদে পদেই এমন অকারণ আশংকায় কেন সে শংকিত হচ্ছে ?

তার মনে পড়ল, যে কয়দিন সে এ বাড়িতে এসেছে, এ সময়টা রোজ সবাই মিলে ওপাশের পাথরের বারান্দায় বসেছে। এইটেই এ বাড়ির রেওয়াজ। তাই আজো তার ডাক পড়েছে। এই তো স্বাভাবিক। বরং এর ব্যতিক্রম হলেই ব্যাপারটা অশোভন হতো।

তাছাড়া বাড়ির মালিক আজ এসেছেন। আসলে তিনিই তো তার নিয়োগ-কর্তা। তাঁর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ-পরিচয় হওয়াই তো সর্বশোভন। এতে আশংকার কি আছে ? বরং এখন যদি তার ডাক না পড়ত, বাড়ির মালিক যদি নির্বিকার ঔদাসীন্যে তাকে এড়িয়ে যেতেন, সেই তো হতো তার কাছে অপমানকর, হতো সাধারণ আতিথেয়তার বিরোধী।

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সুমিতা বলল, তুমি যাও গদাধর, আমি এখুনি যাচ্ছি।

গদাধর চলে গেল। সুমিতা ক্ষিপ্রহস্তে হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিল। আয়নায় একবার দেখল নিজের প্রতিচ্ছবি। দেখল, অকারণ আশংকার লেশমাত্র কোথাও আছে কি না।

হাসি ফুটে উঠল মুখে। নিজের অজ্ঞাতেই সহজ প্রসাধনের একটা সুন্দর আমেজ এসেছে চোখে মুখে। চিরুণীর হালকা টানে কপালের চুলগুলোকে আর একবার সরিয়ে দিয়ে হাসিমুখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দরজার ওপাশ থেকেই কাণে এল, তার সম্বন্ধেই আলোচনা চলছে। পা বাড়াতে যেয়েও একটু থমকে দাঁড়াল সুমিতা।

কথা বলছে সর্বেশ্বর, ভদ্রমহিলার গুণগানে তুমি তো একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছ পিসিমা। এযুগেও কোন মানুষ যদি সত্যি এতটা ভাল হয় সেতো খুব ভাল কথা। অন্তত রাণু সম্বন্ধে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। তবে কি জান, এত অল্প পরিচয়ে একটা গোটা মানুষের সঠিক পরিচয় বোধ হয় জানা যায় না—বিশেষ করে আজ-কালকার লেখাপড়া জানা মেয়েদের।

কথাগুলো শুনে সুমিতার ক্ষুণ্ণ হবার কথা, কথাগুলো তার পক্ষে সুবিশেষণ নয়। তবু সে যেন একটু খুশিই হল, একটু নিশ্চিন্ত হতে পারল। এ ভালই হল যে লেখাপড়া জানা মেয়েদের সম্পর্কে এঁর মনে কোন মোহ নেই।

ধীর পায়ে বারান্দায় ঢুকল সুমিতা।

পিসিমা বললেন, এস মা, এস।

পিসিমার মোড়ার পাশে একটা খালি চেয়ার ছিল। সুমিতা সেইটেতেই আসন নিল।

পিসিমা আবার বললেন, এই সর্বেশ্বর—রাণীর বাবা।

হাত তুলে নমস্কার করল সুমিতা।

সর্বেশ্বর প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলল, পিসিমার কাছে আপনার অনেক কথাই শুনেছি বিকেল থেকে। আপনি রাণুর ভার নিয়েছেন জেনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি। এখন এই পাড়াগাঁয়ে আপনার মন টিকলে হয়।

সুমিতা মুখ নিচু করেই জবাব দেয়, আমি তো কিছু কলকাতা শহর থেকে আসিনি। মফস্বলের ছোট শহর আর এই গ্রামের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নয়।

—আপনার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। নতুন জায়গায় প্রথম প্রথম হয়তো কিছুটা অসুবিধা হবে আপনার। তবে অনুরোধ করছি, যখন যা দরকার বোধ করবেন অসংকোচে জানাবেন। পিসিমার ব্যবস্থায় সাধারণত কোন ত্রুটি থাকে না।

—এই ক'দিনেই আমি তা বুঝতে পেরেছি। এখানে আমার কোন অসুবিধাই হচ্ছে না।

মৃদু হেসে মুখ তুলল সুমিতা। আশ্বস্ত হল। কোন তৃষ্ণার্ত চোখ নিবদ্ধদৃষ্টি নয় তার মুখের উপরে। সর্বেশ্বর চেয়ে রয়েছে সামনের অন্ধকারের দিকে। সে চোখে কোন মোহ নেই, নেই কামনার কণামাত্র ছায়া।

নিজের মনে মনেই বলল, বৃথাই এমন অকারণ আতংকে আমি ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। সর্বপ্রকার নীচতার বহু উর্ধ্বে এ মানুষের স্থান।

রাতের আহারাদি শেষ হবার পর আবার একপ্রস্থ মজলিস বসল পাথরের বারান্দায়।

আকাশে আধখানা চাঁদ উঠেছে তখন। তার আলোয় কেমন মায়াময় লাগছে সামনের অস্পষ্ট গাছপালা মাঠ প্রান্তর।

বাড়ির একপাশে একটা ঝাকড়া মহুয়া গাছ। মৃদু বাতাসে ভেসে আসছে মহুয়া ফুলের গন্ধ। তার পাতায় পাতায় ঝিলমিল করছে চাঁদের আলো।

সর্বেশ্বর সারাক্ষণ প্রায় সেই দিকেই চেয়ে রইল। মাঝে মাঝে দু'চারটি কথার জবাব দিল সংক্ষিপ্ত কথায়।

সুমিতাও স্বাভাবিক সংকোচ বশতঃ মৃদুকণ্ঠে খুব অল্প কথাই বলল।

কেবল অনর্গল কথা বলতে লাগলেন পিসিমা। অধিকাংশ কথাই সুমিতার প্রশংসার আর সর্বেশ্বরের ছোটবেলাকার দুষ্টুমির।

এক এক সময় তিনি খুব বাড়াবাড়ি করলে সর্বেশ্বর বাঁধা দিয়ে বলল, আঃ, তুমি কি সব যা তা বলছ পিসিমা। উনি নতুন মানুষ কি ভাববেন বল তো ?

পিসিমা হেসে বললেন, কে ভাববে ? সুমিতা ? না সর্ব, তেমন মেয়েই ও নয়। কি বল মা ?

সুমিতা মিষ্টি হেসে পিসিমাকে সমর্থন করল।

এমনি আলাপ-অলোচনায় রাত বাড়তে লাগল।

এক সময়ে গদাধর এসে বলল, আমি তাহলে এবার নিচে যাই পিসিমা। বাবুর বিছানা-পত্তর সব ঠিক করে দিয়েছি।

পিসিমা বললেন, বাবুর খাটের পাশে জলের গ্লাস ঢাকা দিয়ে রেখেছ তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা, তুমি যাও।

গদাধর চলে গেল।

পিসিমা বললেন, তুমিও এবার শুয়ে পড় গে সর্ব, রাত অনেক হয়েছে।

—হ্যাঁ যাচ্ছি। আমারও কেমন ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

স্খলিত পায়ে চটি গলিয়ে সর্বেশ্বর টেবিলের উপর থেকে সিগারেটের কৌটোটা হাতে নিয়ে ভিতরে যাবার জন্য পা বাড়াল। দেশলাইটা কখন যে টেবিল থেকে মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল সেটা তার খেয়াল হয় নি। সুমিতা নিচু হয়ে দেশলাইটা কুড়িয়ে নিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, আপনার দেশলাই—

ফিরে দাঁড়িয়ে সর্বেশ্বর বলল, এই দেখুন, দেশলাইয়ের কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। এখুনি ঘরে যেয়ে আবার হাঁকডাক করতে হত। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

সুমিতা বলল, না না, ধন্যবাদের এতে কি আছে। এতো সামান্য কাজ।

সুমিতার দিকে একবার চেয়ে সর্বেশ্বর বলল, সামান্য কাজই তো প্রকৃত ধন্যবাদের যোগ্য সুমিতা দেবী। সংসারে বড় কাজ করবার লোকের বোধ হয় অভাব হয় না, অভাব হয় সামান্য কাজের।

বলেই সর্বেশ্বর হন্ হন্ করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

পিসিমা বললেন, তুমিও এবার শুয়ে পড় গে সুমিতা। যখন তখন বড় বড় কথা বলা সর্বর একটা স্বভাব। ছোটবেলা থেকেই ও একটু খেয়ালী। তাই তো ওর জন্যে আমার এত দুশ্চিন্তা।

নিজের ঘরে এসে তখনি শুতে গেল না সুমিতা। জানলার শিক ধরে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল পূর্ব দিগন্তের দিকে।

একটা অজানা খুশিতে কেমন যেন ভরে উঠেছে তার মন।

সারাটা দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যা একটা কল্পিত আশংকার কাঁটা ওর মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে বিঁধেছে।

সম্ভব-অসম্ভব কত রকম বিপদের কল্পনায় বার বার ও শিউরে উঠেছে। এখানকার সস্নেহ সমাদরের অন্তরালে দেখেছে কুটিল ষড়যন্ত্রের উদ্যত ফণা।

অথচ এরি মধ্যে ওর মনের আকাশের রঙ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যাকে কেন্দ্র করে এত আতংক সেই মানুষটির সঙ্গে সামান্যতম পরিচয়, অতিশয় সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনার ফলেই বিরক্তি ও বিরাগের পরিবর্তে ওর মনের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়েছে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির আবির রঙ।

কেন যেন মনে হয়েছে, বড় অসহায় বড় রিক্ত এই মানুষটি। আর যাই হোক এর সঙ্গে ঝগড়া করা চলে না।

মনের এই আকস্মিক পরিবর্তনে সুমিতা নিজেই বিস্মিত হয়েছে। কেমন করে এ সম্ভব হল? কেনই বা মনের আকাশে উঠল বিরাগের ঝড়, আবার কেনই বা সে আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল মমতার স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক? কেন?

তন্ময় হয়ে নিজের মনের গহনে ডুবে গিয়েছিল সুমিতা। সহসা দূরাগত একটা অস্পষ্ট আর্ত চীৎকারে তার চমক ভাঙল।

মা—গো—ও—

বাইরের চাঁদের আলোয় ধোয়া শান্ত প্রকৃতি যেন সেই আর্তনাদে ভেঙে খানখান হয়ে গেল।

ও কার চীৎকার? কিসের আর্তনাদ?

অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে রইল সুমিতা। কিন্তু আর কোন শব্দ ভেসে এল না তার কাণে। আগেকার আর্তস্বরের ক্ষীণতম পুনরাবৃত্তি আর শোনা গেল না।

তবে কি সুমিতারই শোনবার ভুল?

হতেও পারে। নইলে সত্যি কোন মানুষের আর্তনাদ হলে এই গভীর রাতে মাত্র একটি বার উচ্চারিত হয়েই সে কণ্ঠস্বর এমন বিস্ময়কর ভাবে নীরব হয়ে যাবে কেন?

অথবা এ কি কোন অশরীরী কণ্ঠের আর্তস্বর?

এই পাঁচপুরুষের জমিদার বাড়ির অলিখিত ইতিহাসের সঙ্গে কি যোগাযোগ আছে ওই রহস্যময় আর্তনাদের ?

দূর অতীতের কোন অত্যাচারপীড়িতের অতৃপ্ত আত্মা কি নিশীথ রজনীর স্তব্ধ প্রহরে বারে বারে এমনি করেই মাথা খুঁড়ে মরে এই পাষাণপুরীর প্রাচীরে প্রাচীরে ?

কথাটা মনে হতেই শিউরে চোখ বুঁজল সুমিতা। মাথাটা যেন ঝিম ঝিম করতে লাগল। তাড়াতাড়ি ও বিছানায় এসে মশারি তুলে বালিশে মাথা রেখে চোখ বুঁজল।

শিওরের সেজবাতিটা ঘেরাটোপের নিচে জ্বলতে লাগল। সেটাকে নিভিয়ে দিতে সুমিতার সাহস হল না। কি জানি, আলো-হীন ঘরের অন্ধকারকে ভর করে যদি সেই অশরীরী আত্মারা এসে ভীড় করে ওর ঘরে।

কিন্তু ঘরের আলো জ্বেলে রেখেও বুঝি তাদের আবির্ভাবকে রোধ করতে পারল না সুমিতা। একটা লঘু চরণধ্বনি যেন ওর কাণে এল। রুদ্ধনিশ্বাসে কাণ পাতল সুমিতা। এবার স্পষ্ট শুনতে পেল একটা ক্ষীণ পায়ের শব্দ এই ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে।

গায়ে কাঁটা দিল সুমিতার। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত যেন নামছে নিচের দিকে।

আতংকে চমকে উঠল সুমিতা।

সে স্পষ্ট শুনতে পেল বাইরের বারান্দা দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে কে যেন চলে যাচ্ছে।

কে ও ?

কার ওই বিলীয়মান পদধ্বনি ?

বিদ্যুৎ গতিতে বিছানা ছেড়ে সুমিতা দরজা খুলে বাইরে তাকাল।

অস্তায়মান চাঁদের ম্লান আলোয় টানা বারান্দা জুড়ে অস্পষ্ট আলো-আঁধারী।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক লক্ষ্য করতেই সুমিতা মুহূর্তের জন্য স্পষ্ট দেখতে পেল আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা একটি মূর্তি চকিতে বারান্দার ওপাশে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার দ্রুত পদক্ষেপ তখনো শোনা যাচ্ছে।

আর কাল বিলম্ব নয়। ওই অপস্রিয়মান মূর্তির রহস্য উদ্ঘাটন করতেই হবে।

মুহূর্তে সব ভয় ঝেড়ে ফেলে সুমিতা তাকে অনুসরণ করল।

বারান্দার মোড় ঘুরতেই সুমিতার চোখে পড়ল, বস্ত্রাবৃত মূর্তি সামনের টানা বারান্দার একেবারে শেষের ঘরে ঢুকে পড়ল।

সেও দ্রুত পায়ে হাজির হল সেই ঘরের সামনে। কিন্তু ঘরে ঢুকতে পারল না। সংকোচ এসে পথরোধ করল।

সম্ভবত এইটেই সর্বেশ্বরের শয়নকক্ষ। একটা ভৌতিক মূর্তির অনুসরণ করতে এই গভীর রাতে সে কক্ষে প্রবেশ করবে সে কোন্ অধিকারে? মূর্তি যদি প্রকৃতই ভৌতিক হয়? কক্ষে প্রবেশ করেই যদি সে মূর্তি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়?

আর সর্বেশ্বর যদি জেগে উঠে তাকে দেখতে পান তার ঘরে, তাহলে? কি জবাবদিহি সে করবে? করলেও সে কথা লোকে বিশ্বাস করবে কেন?

বিদ্যুৎ চমকের মত এই কথাগুলো মনে আসতেই কক্ষদ্বারে থমকে দাঁড়াল সুমিতা। কিন্তু সে অতি সামান্য সময়।

পরক্ষণেই অন্ধকার ঘর হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল। আর সেই আলোয় সুমিতা দেখতে পেল ঘরের একেবারে দেয়াল ঘেঁসে বসানো মস্তবড় খাটের মশারিটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

দারুণ আতংকে চীৎকার কার উঠল সুমিতা।

সঙ্গে সঙ্গে তার চীৎকারের প্রতিধ্বনির মত একটা ভয়ংকর খিল্ খিল্ হাসিতে সারা ঘরখানা যেন শিহরিত হয়ে উঠল।

সভয়ে দৃষ্টি ফেরাতেই সুমিতা যেন ভূত দেখার মতই আঁতকে উঠল।

ঘরের কোণে রাখা সেজবাতির পাশে দাঁড়িয়ে বস্ত্রাবৃত একটি নারীমূর্তি।

বিশৃঙ্খল আলুলায়িত তার মাথার চুল।

তুই চোখে জ্বলন্ত অগ্নি-দৃষ্টি।

বিস্ফারিত ওষ্ঠাধরে জিঘাংসার প্রেতছায়া।

কিন্তু ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় নেই। মশারির আগুন লেলিহান শিখা মেলে উর্ধ্বগামী হয়েছে। আর কালবিলম্বে প্রাণসংশয় হবে ভিতরে নিদ্রিত রাজাবাহাত্নরের।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে সুমিতা যন্ত্রচালিতের মত ঘরের কোণ থেকে জলের বড় কুঁজোটা হাতে নিয়ে সবটা জল ছিটিয়ে দিল মশারিতে। আগুনের বেগ তাতে কমলেও একেবারে নিভল না।

সুমিতা তখন আগুন—আগুন বলে চীৎকার করে জ্বলন্ত মশারি তুই হাতে চেপে ধরে সবেগে টান দিল। সেই টানে মশারির দগ্ধ অংশ ছিঁড়ে এল তার হাতে।

|| ৫ ||

গোলমালে সর্বেশ্বরেরও ঘুম ভেঙে গেল। এক লাফে মশারির বাইরে এসে সে দাঁড়াল। সুমিতা তখন খাটের পাশে দাঁড়িয়ে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রয়েছে অর্থশূন্য দৃষ্টি মেলে।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল সর্বেশ্বর, কি ব্যাপার মিস্ রায়? মশারিতে হঠাৎ আগুন লাগল কেন? আর আপনিই বা এ ঘরে এলেন কেমন করে?

চকিতে সেজবাতির দিকে চোখ ফেরাল সুমিতা।

কী আশ্চর্য! ক্ষণেক আগেও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল যে নারীমূর্তি, যার খিল্‌খিল্ অট্টহাসি সে শুনেছে নিজের কানে, সে মূর্তি মুহূর্তে অদৃশ্য হয়েছে।

ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সুমিতা। ঘরে তৃতীয় প্রাণী কেউ নেই। তবে কি প্রকৃতই এ নারীমূর্তি ভৌতিক? ভীত অসহায় দৃষ্টি মেলে সুমিতা তাকাল সর্বেশ্বরের দিকে।

সর্বেশ্বর প্রশ্ন করল, কি হয়েছে মিস্ রায়? এমন ভয়ার্ত চোখে আপনি কি দেখছেন চারদিকে?

কি জবাব দেবে সুমিতা? বুদ্ধি দিয়ে, বিচার দিয়ে কিছুই যে সে বুঝে উঠতে পারছে না। আম্‌তা আম্‌তা করে বলে উঠল, আমি—আমি—বিশ্বাস করুন, নিজের ইচ্ছায় আমি এ ঘরে আসি নি।

কথা শেষ করতে পারল না সুমিতা। মাঝখানেই থেমে গেল।

সর্বেশ্বর বলল, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা কেন তুলছেন মিস্ রায়? আমি আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। অসংকোচে খুলে বলুন কি

ব্যাপার। কে আপনাকে নিয়ে এসেছে এই ঘরে? আর মশারিতে আগুনই বা এল কোথেকে? সেজবাতি তো যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

ধীরে ধীরে যেন নিজেকে ফিরে পাচ্ছে সুমিতা। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে একবার ভেবে নিয়ে সে বলল, দেখুন, আমি যদি বলি যে একটা ভৌতিক ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করেই আমি এ ঘরে এসেছি, আর মুহূর্তমাত্র আগেও সেই ভৌতিক নারীমূর্তি ওই বাতিদানের পাশে দাঁড়িয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হেসেছিল, তাহলে সে কথা কি আপনি বিশ্বাস করবেন?

ভৌতিক নারীমূর্তি!

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল সর্বেশ্বর। গুম হয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, নিশ্চয় বিশ্বাস করব মিস্‌ রায়। আপনি যা দেখেছেন, যা শুনেছেন সব ঠিক।

—বলেন কি রাজাবাহাদুর? অবাক বিস্ময় ঝরে পড়ল সুমিতার কণ্ঠে, এই ছায়ামূর্তি কি আপনি এর আগেও দেখেছেন?

একটু ম্লান হাসি খেলে গেল সর্বেশ্বরের মুখে। তবু সংযত গলায় সে বলল, শুধু একদিন নয় মিস্‌ রায়, দিনের পর দিন ওই মূর্তি আমাকে ঘিরে রয়েছে। তাই ওকে দেখে আপনি যতটা ভীত হয়ে পড়েছেন ততটা ভীত হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু সে কথা থাক। আপনাকে আমি বলতে চাই অন্য একটা কথা। রাজাবাহাদুর ছিলেন আমার পিতৃপুরুষ। সরকারী কলমের এক খোঁচায় সে রাজত্ব আজ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কাজেই রাজাবাহাদুর খেতাবটা আজ আমার কাণে ব্যঙ্গের মতই শোনায়। তাই সাপের মরা খোলসের মতই ওটা আমি পরিত্যাগ করেছি। এ বাড়িতে আপনি নতুন এসেছেন, তাই কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম। দয়া করে রাজাবাহাদুর বলে আমাকে ডাকবেন না।

বিস্মিত হল সুমিতা। রাজাবাহাদুর ডাক সর্বেশ্বর পছন্দ করে না তা পিসিমার মুখে এর আগেই সে শুনেছে। শুধু ঘটনার আকস্মিকতায় সে কথা সে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু বিস্ময় সেজন্য নয়। বিস্ময় সর্বেশ্বরের পরম নির্বিকারতায়। গভীর রাতে নিদ্রিত অবস্থায় একটা প্রেতমূর্তি ঘরে ঢুকে তাকে অগ্নিদগ্ধ করতে চেষ্টা করেছে, এত বড় একটা ভয়ংকর সংবাদকে যে এমন অবলীলাক্রমে গ্রহণ করতে পারে, এতটুকু ভয় বা বিস্ময় যাকে বিচলিত করে না, সে কেমনধারা মানুষ। নিজের জীবনকে এক অশরীরী জিঘাংসার হাতে ছেড়ে দিয়ে এমন পরম নিশ্চিন্ততায় সে দিন কাটায় কেমন করে!

সুমিতার চীৎকারে বাড়ির অন্য সবায়ের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আগে গদাধর তার পিছনে পিছনে পিসিমা ও অপর কয়েকজন গৃহবাসী এসে ঘরে ঢুকল।

পিসিমা প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে রে সব? সুমিতা হঠাৎ এমন চীৎকার করে উঠল কেন? এ কি? মশারিতে আগুন ধরল কেমন করে?

সর্বেশ্বর জবাব দিল হাল্কা হাসির সুরে, ও কিছু নয় পিসিমা। বোধ হয় সিগারেট খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারই আগুন মশারিতে ধরে যায়। ঘুমের ঘোরেই আমি চীৎকার করে উঠি। আর সেই চীৎকার শুনে উনি এসে পড়েন। আগুন নেভাতে যেয়ে বোধ হয় ওর হাতও খানিকটে পুড়েছে।

—তাই নাকি? দেখি দেখি, বলতে বলতে পিসিমা সুমিতার হাত দুখানি তুলে ধরলেন, তাইতো, এ যে বেশ খানিকটে পুড়ে গেছে। গদাধর, শিগগির যাও তো বাবা, রান্না ঘর থেকে স্পিরিটের বোতলটা নিয়ে এস।

গদাধর বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এল স্পিরিটের বোতল নিয়ে। পিসিমা নিজেই স্পিরিট দিয়ে ধুইয়ে দিলেন সুমিতার

হাত। সুমিতা সংকোচের সঙ্গে বলল, আপনি শুধু শুধু এতটা ব্যস্ত হচ্ছেন পিসিমা, আমার সামান্যই লেগেছে।

হাতের কাজ করতে করতেই পিসিমা বললেন, কি যে তোমাদের সামান্য আর কি যে অসামান্য তা তোমরাই জান। আমি তো দেখছি তোমার হাত দুখানি বেশ জখম হয়েছে।

তারপর গদাধরের দিকে চেয়ে বললেন, গদাধর, তুমি মশারিটা খুলে বাবুর বিছানাটা ঠিক করে দিয়ে এস। আমরা চললাম। চল মা।

বাধা দিল সর্বেশ্বর, এই শেষ রাতে আর বিছানা ঠিক করতে হবে না পিসিমা। ঘুম আর আসবে না। যেটুকু রাত আছে আমি এই শোফায় শুয়েই কাটিয়ে দিতে পারব।

সবাই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সর্বেশ্বর ডাকল, মিস্ রায়, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

পা বাড়িয়েই সর্বেশ্বরের ডাকে ফিরে দাঁড়াল সুমিতা, বলুন।

—আমার জীবন হয়তো আজ আপনার জন্যই রক্ষা পেল। সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানানো আমার কর্তব্য।

সুমিতা মুখ নিচু করেই বলল, দেখুন, ঠিক ধন্যবাদ দেওয়া না দেওয়ার কথা তো নয়। আমি শুধু ভাবছি, আর একটু হলেই কি সর্বনাশটাই না হতে পারত।

হঠাৎ মুখ তুলে সুমিতা জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, এই ছায়ামূর্তির কথা এ বাড়িতে এক আপনি ছাড়া আর কি কেউ জানে না? এমন কি পিসিমাও না?

সুমিতার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে সর্বেশ্বর পাল্টা প্রশ্ন করল, কি করে আপনি বুঝলেন যে আর কেউ জানে না?

—নইলে আপনার মুখের ওই বানানো কথাটা বিশ্বাস করেই সবাই চিশ্চিন্ত মনে চলে গেল কেমন করে?

—সবাই হয় তো নিশ্চিন্ত মনে চলে যায় নি মিস্ রায়। চাকর-বাকরদের কথা বাদ দিন! আমার কতটুকু খবরই বা ওরা রাখে। কিন্তু পিসিমা অত্যন্ত চাপা লোক। আমার জীবনের এ দুর্ভাগ্যের খবর তাঁর অজানা নয়। সে হয় তো ব্যাপারটা বুঝতেও পেরেছে। কিন্তু যে সংকটের কোন প্রতিকার নেই তা নিয়ে অনর্থক হৈ চৈ করে তো কোন লাভ নেই, আর তা করবার মত মানুষও সে নয়।

—কিন্তু দুর্ভাগ্যের হাতে নিজেকে এমন করে ছেড়ে দেওয়াও তো ঠিক নয় মিঃ রায়। আর কিছু না হোক, অন্ততঃ আত্মরক্ষার একটা ব্যবস্থা তো আপনার করা উচিত। ভেবে দেখুন তো, আমার আসতে আর একটু দেরি হলে ওই মশারির আগুনে কি অনর্থই না ঘটতে পারত।

—দেখুন মিস রায়, ঠিক সময়ে আপনি এসে পড়েছেন এও হয়তো বা আমার ভাগ্যেরই নির্দেশ।

কথাটা কাণে যেতেই চমকে মুখ ফেরাল সুমিতা।

সর্বেশ্বরও কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সে চাউনির সামনে। কথার জবাব হিসাবেই কথাটা সে বলেছে। কিন্তু বলে ফেলবার পরই তার নিজের কাণেই যেন কথাটা কেমন বেসুরো লাগল। মনে হল, কথাটা এভাবে বলা তার উচিত নয় নি। ত্রুটি স্বীকারের ভঙ্গীতে সর্বেশ্বর বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না মিস রায়। কোন কিছু ভেবে কথাটা আমি বলি নি।

সুমিতা ধীর গলায় বলল, না না, মনে আমি কিছু করি নি। আমি শুধু একটা মিনতি জানাতে চাই, নিজের সম্বন্ধে আপনি একটু সজাগ হোন। আপনাকে কোন রকম পরামর্শের কথা শোনান আমার উচিত নয়। কাল দিনের আলোয় সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় শোনাতে আমি পারবও না। তবু আজকের এই অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর সামনে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলবই। দেখুন মিঃ রায়,

ভাগ্যের নির্দেশই মানুষের জীবনের শেষ কথা নয়। ব্যক্তির স্বপ্ন ও সাধনার মূল্যও জীবনে অবশ্য স্বীকার্য।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সর্বেশ্বর বলল, বেশ, এদিক থেকে তো ভেবে দেখি নি। এবার থেকে না হয় নতুন করে ভাবতে চেষ্টা করব। কিন্তু রাত ক্রমেই বাড়ছে। আপনি আর দেরি করবেন না। এবার শুয়ে পড়বেন চলুন।

সর্বেশ্বর এগিয়ে সুমিতাকে পথ দেখাবার জন্য পা বাড়াতেই সুমিতা বলল, আপনাকে আর কষ্ট করে সঙ্গে আসতে হবে না। নিজের ঘরের পথ আমি নিজেই চিনে নিতে পারব।

সুমিতা পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সর্বেশ্বর তার গমন-পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

চাঁদ ডুবে গেছে। চারিদিক আঁধারে ঢাকা। শুধু বাতাসে ভেসে আসছে মহুয়া ফুলের গন্ধ।

বড় মিষ্টি গন্ধ!

॥ ৬ ॥

নবনির্মিত 'রায়গড়'-এর ছাদে দাঁড়িয়ে অনেক কাল আগে আরো একজনের মনে হয়েছিল বড় মিষ্টি—বড় মিষ্টি মহুয়া ফুলের এই গন্ধ।

'রায়গড়'-এর মাথার উপরে সেদিন হেসে উঠেছিল শরতের নীল-নীল জ্যোৎস্না।

তরুণ জমিদার শিবশেখরেশ্বর রায় দুটি স্বপ্ননীল চোখের তারায় নিজের অপলক দৃষ্টি রেখে মৃদু হেসে বলেছিল, বড় মিষ্টি এই মহুয়া ফুলের গন্ধ, কি বলো ?

স্বপ্ননীল চোখের তারা দুটি নাচিয়ে অপর্ণা শুধু হেসেছিল।

শিবশেখর বলল, না না, শুধু হাসলে চলবে না অপর্ণা। এমন রাতে তোমার মুখের কথা আমি শুনতে চাই।

মিষ্টি হেসে অপর্ণা বলল, যদি না বলি ?

—না না, সে হবে না। কথা তোমাকে বলতেই হবে।

—কেন ? জোর নাকি ?

—হুঁ, দরকার হলে তাই। কেন জোর আমার নেই না কি ?

—ওঃ বাবা, তা আর নেই ! নবাব আলিবর্দী খাঁর তক্তের পাশে তোমার আসন, তোমার আবার জোর নেই ! নাও হল তো ? এই তো অনেক কথা বললাম।

—না গো না, ও কথা নয়। আজ রাতে আকাশে এমন মিষ্টি চাঁদ, বাতাসে মহুয়া ফুলের কেমন মিষ্টি গন্ধ, আমার পাশে তুমি এমন মিষ্টি মানুষটি, দোহাই তোমার অপর্ণা, দুটি মিষ্টি কথা তুমি বলো আজ।

ঢং-ঢং-ঢং-ঢং···

ওকি ?

উৎকর্ণ হয়ে উঠল শিবশেখর। এমন অসময়ে 'রায়গড়-এর সদরে-রাখা পেটা ঘড়িতে পাগলা-ঘন্টি বাজিয়ে দিল কে ?

কিসের এই বিপদ-সংকেত ?

শিবশেখর ছাদের সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হতে হতে বলল, তুমি এখানেই থেকো অপর্ণা, খবরটা নিয়ে আমি এখুনি আসছি।

সে-রাতে আর মহুয়া ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভরা ছাদে ফিরে আসেনি শিবশেখর। আসতে পারেনি।

পাগলা-ঘন্টি শুনেই সদর দরজা খুলে দিয়েছিল দ্বার-রক্ষীরা।

বাইরে দাঁড়িয়েছিল রাঘব সর্দার। রায় জমিদারদের অনুগত পাইক। এ অঞ্চলের নাম-করা লেঠেল। কালো কুচকুচে গায়ের রং। পুরো চার হাত বেশীবহুল দেহ। মাথায় কোকড়ানো বাবরি চুল। হাতে অব্যর্থ লাঠি। একাই একশো লোকের মহড়া নিতে পারে শুধু লাঠি হাতে।

সেলাম ঠুকে রাঘব বলল, হুজুর কোথায় ?

—আছেন ভেতরে।

—শিগগির এত্তেলা পাঠাও। বল, রাঘব দেখা করবে। জরুরী দরকার।

ততক্ষণে দোতলার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে শিবশেখর। সেখান থেকেই বলল, তুমি দোতলায় উঠে এস রাঘব।

—পেন্নাম হই হুজুর। বলে হাতের লাঠিখানাকে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রেখে তিন লাফে উঠে গেল রাঘব। সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল মনিবকে।

শিবশেখর শুধাল, কি খবর রাঘব ? এত রাতে কোত্থেকে এলে ?

—সর্বনাশ হয়েছে হুজুর।

—সর্বনাশ ?

—হ্যাঁ হুজুর, বর্গীরা আসছে।

বর্গী !

মারাঠা দস্যুর দল !

'চৌথ' আদায়ের নামে বার বার তারা হানা দিয়েছে সুজলা সুফলা বাংলা দেশে। যে পথ ধরে তারা গেছে ধ্বংসের আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে পথের দুই পাশ। বর্গীর অত্যাচার ত্রাসের সৃষ্টি করেছে বাংলার ঘরে ঘরে। সেই লুঠেরা বর্গীর দল আবার আসছে !

কথাটা শোনামাত্র অজ্ঞাত আতংকের একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন নেমে গেল শিবশেখরের শিরদাঁড়া বেয়ে।

কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। পরমুহূর্তেই শিরদাঁড়া সোজা করে সে দাঁড়াল। দৃঢ় সংকল্পে শক্ত হয়ে উঠলো তার মুখের চোয়াল। স্বাভাবিক গলায় সে বলল, এ খবর তুমি পেলে কোথায় ?

—বিশেষ কাজে আমি বিষ্ণুপুর শহরে গিয়েছিলাম হুজুর। সেইখানেই খবর পেলাম। কাছেই কোন্ শালবনে নাকি তারা ছাউনি ফেলেছে।

বিস্মিত হল শিবশেখর, বিষ্ণুপুর শহর ? সে যে এখান থেকে একদিনের পথ। তুমি একটি মাত্র দিনের মধ্যে সেখানে যেয়ে আবার ফিরলে কি করে' ?

—হুজুরের আশীর্বাদ আর আমার রণ-পার কেরামতী হুজুর। রাত ফরসা হবার আগেই বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম হুজুর। দুপুর গড়িয়ে পৌঁছলাম সহরের কাছে। কেমন কেমন যেন ঠেকতে লাগল। চারদিকে থম্‌থমে ভাব। রাস্তায় লোকজন নেই। কি ব্যাপার ? খবর নিলাম। সব শুনে তখুনি রণ-পা চালিয়ে দিলাম

উল্টোমুখে। পথে আর কোথাও দাঁড়াই নি হুজুর। পা থেকে রণ-পা খুলেছি একেবারে 'রায়গড়ে'র দরজায়।

উল্লসিত হয়ে শিবশেখর বলল, সাবাস রাঘব, সাবাস। এ কাজের ইনাম তোমার পাওনা রইল।

আভূমি সেলাম ঠুকে রাঘব বলল, হুজুরের খেয়েই তো মানুষ আমরা। কিন্তু হুজুর সে শিব ঠাকুরের চেলারা তো এদিক পানেও আসতে পারে।

—তাতো পারেই। হয়তো আসবেই। সেই জন্যেই তো গড়ের মত করে তৈরী করেছি এই 'রায়গড়'। সাতমহলা বাড়ির একটি মাত্র দরজা। পারবে না তোমরা পাইক-বরকন্দাজ-লেঠেলরা মিলে একে রক্ষা করতে ?

—জান কবুল, আমরা চেষ্টার ত্রুটি করব না হুজুর।

—ব্যস্, তাহলেই হবে। কিন্তু এখন অনেক রাত। তুমি বাড়ি যাও। কাল সকালেই সব বন্দোবস্ত করতে হবে। বিনা এত্তেলাতেই চলে আসবে ভোরে।

—যেমন হুজুরের হুকুম।

আর একবার অভিবাদন জানিয়ে রাঘব সর্দার বিদায় নিল। তার ভারি পায়ের শব্দ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে মিলিয়ে গেল।

মুখ ফিরিয়ে ভিতরের দিকে পা বাড়াতেই শিবশেখর দেখল দরজার পর্দাটা ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে অপর্ণা। ঠোঁটে তার মৃদু হাসি।

—তুমি ?

—গোস্তাকি মাফ হয় হুজুর। আপনার হুকুম অমান্য করে নিচে নেমে এসেছি। ছাদে আর ভাল লাগল না একা একা।

বলেই খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল অপর্ণা।

পরদিনই কিন্তু মিলিয়ে গেল সে হাসি। অশ্বখুরের খটাখট শব্দে কোথায় তলিয়ে গেল মিষ্টি হাসির সেতারের টুং টাং।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়।

মোগল সাম্রাজ্যের তখন অন্তিমকাল সমুপস্থিত।

সাম্রাজ্যের সৌধ-ভিত্তিতে যে ফাটল দেখা দিয়েছিল ঔরংজেবের আমলে, কালক্রমে তার কবলে পড়ে ধূলায় গড়িয়ে পড়ল মোগল গৌরবের শেষ মিনার-চূড়া।

নাদির শাহের আক্রমণে একটি মাত্র উদয়াস্তের মধ্যে দিল্লী শহরের ত্রিশলক্ষ নরনারীর তাজা রক্তে লাল হল রাজধানীর পথ। অসহায় সম্রাট মহম্মদ শাহ্ কোহিনুর আর ময়ুর সিংহাসন উপহার দিয়ে রক্ষা পেল তুর্কি-সর্দারের রোষবহ্নি থেকে।

আবার আঘাত হানলে আহম্মদ শাহ আবদালী। ফলে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ। পানিপথের প্রান্তরে সেদিন অস্তমিত হল মোগল-সাম্রাজ্য-রবি।

সুযোগ পেয়ে স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠল ক্ষমতালোভী প্রাদেশিক শাসনকর্তার দল।

দাক্ষিণাত্যে নতুন রাজ্য স্থাপন করল চীনকিলিচ খাঁ।

স্বাধীন হলো অযোধ্যার নবাব সাদৎ খাঁ।

রোহিলাখণ্ড আর ফরাক্কাবাদও স্বাধীনতা ঘোষণা করল।

আর বাংলা-বিহারের বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী খাঁ দিল্লীর তখ্ত-এ-তাউসের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতে শুরু করল।

কিন্তু সে কেমন রাজ্য ?

বাংলার মসনদকে ঘিরে তখন চলেছে হীন চক্রান্ত আর জঘন্য ব্যাভিচার।

সুজাউদ্দীনের পর সরফরাজ খাঁ। তারপর আলিবর্দি। আর তারো পরে অপরিণতবুদ্ধি নবাব সিরাজদ্দৌল্লা।

চারিদিকে শুধু অন্যায় আর অত্যাচার, হত্যা আর ষড়যন্ত্র।

আর বাংলার সেই চরম দুর্দিন ও বিশৃংখলার সুযোগ নিয়েই নবজাগ্রত মারাঠা শক্তির তদানীন্তন প্রতিনিধি রঘুজী ভোঁসলের নির্দেশক্রমে হাজার হাজার বর্গী সৈন্য নিয়ে মারাঠাবীর ভাস্কর পণ্ডিত হানা দিল বাংলার শ্যামল বুকে।

বাদশাহ্ ঔরংজীবই শেষ বয়সে স্বীকার করে নিয়েছিল যে, মোগল রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ বা চৌথ পাবে মারাঠারা। সেই চৌথ আদায়ের ছল করেই মারাঠা বর্গীরা আক্রমণ করল বাংলা দেশ।

উড়িষ্যার গিরিনদী পার হয়ে পঞ্চকোটের পার্বত্য পথ দিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল বিষ্ণুপুর বীরভূমের ভিতর দিয়ে রাঢ় বাংলার দিকে।

হাজারে হাজারে তারা এল পঙ্গপালের মত।

লুণ্ঠন আর হত্যা, গৃহদাহ আর নারীধর্ষণ।

সারা রাঢ়-বাংলা জুড়ে হাহাকার উঠল।

বালেশ্বর থেকে রাজমহল, মেদিনীপুর থেকে বর্ধমান—বর্গীদের ঘোড়ার খুরে খুরে আর তলোয়ারের আঘাতে আঘাতে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

তেমনি কান্নার রোল উঠল পরদিন দুপুরে রায়গড়ের অন্দরমহলে।

প্রাসাদের সর্বত্র চাপা গলায় একই আলোচনা: বর্গীরা এবার আক্রমণ করবে 'রায়গড়'। কে তাদের কানে তুলেছে, 'রায়গড়-এর কোষাগারে সঞ্চিত আছে অপর্যাপ্ত ধনসম্পদ। তারই লোভে সঙ্গীন উচিয়ে ছুটে আসছে মারাঠা বর্গীর দল।

সংবাদ এসেছে, আর বেশি দূরে নেই লুটেরা বর্গীর দল। অশ্ব

খুরে খুরে লাল মাটির ধুলো উড়িয়ে তারা আসছে। তাদের লক্ষ্য 'রায়গড়'-এর অফুরন্ত ধনরত্ন।

কি হবে ?

চিন্তায় কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে শিবশেখরের ললাট। কপালের দুপাশের শিরা দুটো দপ দপ করছে অসহ্য উত্তেজনায়।

পাশে দাঁড়িয়ে রাঘব সর্দার।

'রায়গড়-এর ছাদের উপরে, বুরুজের মাথায় মাথায় তীর, ধনুক, বর্শা-বল্লম নিয়ে তৈরী হয়ে আছে পাইক সর্দারের দল। সদর দরজার পাশে একটা ঘরে থরে থরে সাজানো রয়েছে ঢাল আর তলোয়ার। সম্মুখ যুদ্ধের প্রয়োজন হলে দরকার হবে সে সব হাতিয়ার।

তবু দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে উঠেছে 'রায়গড়-এর মালিক। বর্গীরা সংখ্যায় অনেক বেশি। সঙ্গে তাদের কামান-বন্দুক। তাদের সঙ্গে কি আঁটতে পারবে ঢাল-তলোয়ার, তীর-ধনুকধারী পাইকের দল ?

যদি না পারে ?

দুরন্ত বর্গীরা যদি ঢুকে পড়ে 'রায়গড়'-এর অন্দরে ?

সঞ্চিত সব ধনরত্ন তারা লুটে নিয়ে যাবে। তা যায় যাক। সম্পদ-সমৃদ্ধি পদ্মপত্রে নীড়। আজ আছে কাল নেই। তা যায় যাক। সে জন্য ক্ষোভ নয়।

কিন্তু যদি তারা আঘাত করে রায়বংশের মর্যাদায় ? কুলনারীর সম্মান যদি লুণ্ঠিত হয় ? অপর্ণার দুই চোখে যদি নামে অসম্মানের অশ্রুধারা ?

না না, শিবশেখর আর ভাবতে পারে না। দ্রুত পায়চারি করতে লাগল সে।

রাঘব বলল, আপনি ভাববেন না হুজুর। আমাদের জান থাকতে লুটেরারা মা-লক্ষ্মীর গায়ে হাত তুলতে পারবে না।

—সে আমি জানি রাঘব। সে আমি জানি। কিন্তু তারা যে

আসছে কামান-বন্দুক নিয়ে। তীর-ধনুক আর বর্শা-বল্লম নিয়ে তোমরা কতক্ষণ তাদের সঙ্গে লড়বে ?

কি বলতে যেয়ে চুপ করে গেল রাঘব।

শিবশেখর একটু পরে বলল, তার চেয়ে এক কাজ করতে পার রাঘব ?

—হুজুর।

—খবর পেয়েছি, বর্গীদের দমন করবার জন্য স্বয়ং নবাব এসেছেন মেদিনীপুরে। ছাউনি ফেলেছেন সেখানে। তাকে যদি একটা খবর দিতে পার তাহলে হয়তো—

কথাটা আর শেষ করল না শিবশেখর। কি ভেবে সে চুপ করল।

একটু পরে রাঘব বলল, হুজুর যদি বলেন, এখুনি আমি মেদিনী-পুর রওনা হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি ফিরে আসার আগেই যদি বর্গীরা 'রায়গড়ে' হাজির হয় ?

রাঘবের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে শিবশেখর বলল, তোমাদের হুজুর আজো একেবারে মরে যায় নি রাঘব। তোমার কাছেই তো তীর-ধনুক-তলোয়ারের খেলা আমি শিখেছি।

দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে রাঘব বলল, আমার অপরাধ হয়েছে হুজুর। আমি এখুনি রওনা হচ্ছি।

—শোন। যাবার আগে অন্দরে যাও। পেট ভরে খেয়ে তার পর যাত্রা কর। যা দিনকাল। বলা যায় না, পথে খাবার জুটবে কি না।

মাথা নেড়ে রাঘব অন্দরের দিকে পা বাড়াল।

শিবশেখর বড় বড় পা ফেলে ছাদে উঠে গেল।

বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বর্গীরা হানা দিল রায়গড়ে।

শিবশেখর তৈরী হয়েই ছিল। মারাঠা বর্গীদের অশ্ব খুরে খুরে যেমন এগিয়ে এল রাঙা ধুলোর মেঘ, অমনি বাঙালী তীরন্দাজদের ধনুক হতে তীর ছুটতে লাগল বৃষ্টিধারার মত।

প্রথম আক্রমণে হতচকিত হয়ে গেল বর্গীরা। এমন দৃঢ় প্রতি-রোধ তারা আশা করেনি। বাংলার মাটিতে পা দিয়ে যেখানে তারা গেছে সেখানেই শুনেছে শুধু পালা—পালা।

অবাধে চালিয়েছে লুণ্ঠন আর নরহত্যা।

স্বয়ং নবাব আলিবর্দী পর্যন্ত ত্রস্ত-ব্যতিব্যস্ত হয়েছে তাদের আক্রমণে।

আর সেই বাংলা দেশের একজন ক্ষুদে তহশিলদার এমন রক্ষিত দুর্গের আড়াল থেকে দৃঢ় হস্তে তাদের বাধা দেবে, এ তারা ভাবতেও পারেনি। তাই প্রথম আক্রমণে তারা পিছু হটতে বাধ্য হল।

কিন্তু সন্ধ্যার আগেই তারা নতুন করে হানা দিল। তীরবৃষ্টির ভিতর দিয়েই বীরবিক্রমে এগিয়ে এল রায়গড়ের সিংহদরজায়। কামান সাজাল দরজা সোজা করে।

রায়গড়ের ছাদে দাঁড়িয়ে প্রমাদ গুণল শিবশেখর। সিংহদরজা যদি উড়ে যায় মারাঠাদের তোপের মুখে, তাহলে মুষ্টিমেয় লেঠেল আর বর্শা বল্লমধারী পাইক নিয়ে কি করে সে রায়গড় রক্ষা করবে?

তবু হার মানলে চলবে না। রায়গড়ের সম্মান, রায়বংশের মর্যাদা বাঁচাবার পবিত্র দায়িত্ব তার শিরে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। সদলে নিচে নেমে এল শিবশেখর। সবাইর হাতে তুলে দিল তলোয়ার আর বর্শা। সিংহদরজার দুই পাশে সারি দিয়ে তারা দাঁড়াল। সিংহদরজা ভেঙে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেই সরু প্রবেশ-পথেই বাধা দিতে হবে বর্গীদের।

এমন সময় বাইরে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—হর হর মহাদেও।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল কামান।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে কামান-গর্জনকেও ছাপিয়ে ভেসে এল নবাবী ফৌজের রণ-হুংকার।

তাদের অশ্বখুর ধ্বনিতে প্রকম্পিত হল দিক-দিগন্ত।

তোপের আঘাতে ভেঙে পড়ল রায়গড়ের সিংহদরজা। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেল প্রবেশ-পথ।

কিন্তু সে পথ দিয়ে প্রবেশ করা হল না বর্গীদের।

পিছন থেকে ছুটে আসছে নবাবী ফৌজ। সম্মুখে রয়েছে সুরক্ষিত রায়গড়। দুদিক থেকে আক্রান্ত হলে ধ্বংস অনিবার্য।

তাই কালবিলম্ব না করে কামান তুলে নিয়ে বিপরীৎ পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল বর্গীর দল।

মুহূর্তে জনশূন্য হয়ে গেল রায়গড়ের প্রবেশ-পথ।

মহা-উল্লাসে বাইরে ছুটে গেল শিবশেখর।

তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল দুজন নবাবী সৈন্য। ঘোড়া থেকে নেমে কুর্নিশ জানিয়ে তারা বলল, স্বয়ং নবাব এসেছেন রায়গড়ের অতিথি হয়ে। সঙ্গে তাঁর প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজদ্দৌল্লা।

নবাব এসেছেন। নবাব আলিবর্দি খাঁ! সঙ্গে সিরাজদ্দৌল্লা! বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাবী নবাব!

অতিথির সাদর অভ্যর্থনার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠল শিবশেখর।

বারুদের ধোঁয়ায় আছন্ন রায়গড় ঝলমল করে উঠল ঝাড়বাতির রোশনাইতে।

মৃত্যু-চীৎকার বিপর্যস্ত রায়গড়ের নহবৎখানায় বেজে উঠল সানাইয়ের সুর।

সে-রাতটা রায়গড়ে কাটিয়ে রাজধানী মুক্শুদাবাদে ফিরে গেল নবাব আলীবর্দি খাঁ। ফিরে গেল তার আদরের দৌহিত্র ভাবী

নবাব সিরাজদ্দৌল্লা বাহাদুর। কিন্তু পিছনে রেখে গেল তার লালসা-লোলুপ দৃষ্টি।

সপ্তাহ যেতে না যেতেই ভাবী নবাবের দূত এল রায়গড়ে। জানাল, রায়গড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই ভাল লেগেছে নাতি-সাহেবের। তাই শীঘ্রই তিনি আবার আসবেন রায়গড়ে অবসর যাপনের জন্য। বর্গীদের পিছনে পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এবার কয়েকদিন বিশ্রাম চাই।

কুঞ্চিত হয়ে উঠল শিবশেখরের প্রশস্ত ললাট। মুক্‌শুদাবাদের এই তরুণ নাতিসাহেবের অনেক কুকীর্তির কথা সে শুনেছে। দেখেছেও। তার এ রায়গড় অভিযান যে নিছক অবসর যাপন নয়, এর অন্তরালে রয়েছে কোন অসৎ অভিপ্রায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তাহলে উপায়?

সিরাজদ্দৌল্লার পাপ-দৃষ্টি থেকে কেমন করে সে রক্ষা করবে রায়-গড়ের মর্যাদা?

অপর্ণার রূপের খ্যাতি আছে এ অঞ্চলে তা সে জানে। কিন্তু সে খ্যাতি যে সুদূর মুকশুদাবাদের প্রাসাদেও বিস্তারলাভ করেছে আর সেই খ্যাতিই যে নাতিসাহেবের রায়গড়-প্রীতির কারণ, সে কথা বুঝতে বিলম্ব হল না শিবশেখরের।

তাহলে?

গভীর রাতে রায়গড়ের মন্ত্রণা-কক্ষে ডাক পড়ল প্রবীণ নায়েব দুর্গাচরণের।

অনেক পরামর্শ হল দুজনে। স্থির হল রায়বংশের মর্যাদা রক্ষার নতুন ব্যবস্থা।

পাতাল ঘর!

রায়গড়ের অন্দর মহলের তলায় মাটির নিচে গড়ে তুলতে হবে একটি গোপন মহল। পাতাল ঘর।

অত্যন্ত গোপনে তৈরী করতে হবে সে ঘর। একমাত্র শিবশেখর আর অপর্ণা ছাড়া আর কেউ জানবে না পাতাল ঘরের গুপ্ত দরজার সন্ধান।

রায়গড়ের ভিতরে থেকেও সে পাতাল ঘর থাকবে রায়গড় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সতর্কতম অনুসন্ধানেও তিলমাত্র নির্দেশ কেউ পাবে না সে ঘরের।

স্থির হল, নাতিসাহেবের আগমনের পূর্বমুহূর্ত থেকে তার যাত্রার ক্ষণ পর্যন্ত অপর্ণা থাকবে সেই পাতাল ঘরে—ভাবি নবাবের লালসা-দীপ্ত নয়নের সম্পূর্ণ অগোচরে।

আর প্রকাশ্যে একটি নকল মৃতদেহের অগ্নি-সৎকার করে বাইরে রটিয়ে দেওয়া হবে অপর্ণার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ।

পাতাল ঘর!

ভাবী নবাবের লালসা-বহ্নি থেকে সে ঘর রায়-বধূ অপর্ণাকে বাঁচিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তার রোষ-বহ্নি থেকে রেহাই পায়নি শিবশেখর।

ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে নাতিসাহেব শিবশেখরকে নজর-বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল মুকশুদাবাদে। সেখানে আটক করে রেখেছিল তাকে তিন দিন তিন রাত।

ক্রমে সে খবর উঠল বৃদ্ধ নবাবের কাণে। তাঁরই হস্তক্ষেপের ফলে উদ্ধার পেয়ে রায়গড়ে ফিরে এসেছিল শিবশেখর।

এসেই সোজা ঢুকেছিল পাতাল ঘরে। অশ্রুমুখী অনাহারক্লিষ্টা অপর্ণাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আজ থেকে এই প্রথা প্রচলিত হোক যে, রায়-বংশের প্রত্যেক অনাগত বংশধর বিবাহ-রাতে নববধূকে জানাবে এই গোপন পথের সন্ধান—জানাবে চরমতম বিপদের দিনে জীবন ও সম্মান রক্ষার শেষ আশ্রয় পাতাল ঘরের কথা।

তারপর—

ইতিহাসের অনেক আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে গেছে রায়বংশের-ইতিহাস।

শিবশেখরেশ্বর রায়ের আমলে গড়া সুদৃঢ় দুর্গ-ভবন রায়গড়ের সুনিপুন পংখের পালিশের উপর পরতে পরতে পড়েছে ধুলোবালি আর শেওলার আচ্ছাদন।

বর্গীদের তোপে ধ্বসে-পড়া সিংহদরজার জায়গায় নতুন করে গড়ে-তোলা শালকাঠের দরজার লোহায় মরচে ধরেছে।

কার্নিশের ফাঁকে ফাঁকে পায়রা ও চামচিকেরা বাসা বেঁধেছে।

ক্রমে কোথাও ধ্বসে গেছে বালি। কোথাও লোনা ধরেছে। রং-করা কাঠের দরজা জানালায় ঘুণ ধরেছে।

ঘুণ ধরেছে বাংলার মসনদেও।

আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পরে মসনদে বসল সিরাজদ্দৌল্লা। আলি-নগরে একহাত নবাবী খেল্ দেখাতে না দেখাতেই পলাশীর প্রান্তরে শুরু হল নতুন খেল্।

সিরাজের রক্তে খোসবাগের মাটি লাল করে দিয়ে মীরজাফর উঠে এল মসনদে। কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে সেও একদিন বিদায় নিল দুনিয়ার মসনদ থেকে।

এল কাশেম আলি খাঁ। উদয়নালার গোপন গিরিপথ ধরে পরাজয় এসে তারও পিঠে বসিয়ে দিল রক্তাক্ত ছুরি।

১৭৬৫ খৃস্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জাঁকিয়ে বসল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী গদিতে।

কেরানী ক্লাইভ তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে একদিন বাংলার লাটসাহেব হয়ে বসল।

ইতিহাসের পথ তবু শেষ হয় না।

১৭৯৩ খৃস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তন করল।

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে রায়গড়ের জমিদারী ইতিহাসেও শুরু হল এক নতুন যুগ।

জমিদার চন্দ্রশেখরেশ্বর রায়ের নামের মাথায় বসল ইংরেজ কোম্পানীর দেওয়া নতুন 'রাজাবাহাদুর' খেতাব।

রায়গড়ের ধুলোবালি আর শেওলার আচ্ছাদনের উপর লাগল নতুন চুনকামের আবরণ। নতুন জৌলুসে ঘরে ঘরে জ্বলল ঝাড়-লণ্ঠনের রোশনাই। রেশমী-কাপড়ের ঝালর দোলানো নহবৎখানায় বাজল সানাইয়ের মিঠে সুর।

রায়গড়ের সিংহদরজায় বসানো হল নতুন নামের ফলক—'রাজবাড়ি'।

॥ ৭ ॥

বাকি রাতটুকু আর ঘুমল না সর্বেশ্বর। সোফাটাতেই পড়ে রইল চোখ বুঁজে।

পড়ে পড়ে ভাবতে লাগল নিজের দুর্ভাগ্যের কথা। দুঃসহ অলাতচক্রের পথেই কি আজীবন তাকে ঘুরে মরতে হবে? যে দুর্ঘটনা একান্তই আকস্মিক, যার জন্যে এতটুকু দায়িত্ব তার নেই, তারই দুঃসহ বোঝা কি তাকে বয়ে বেড়াতে হবে সমস্ত জীবন?

অপরূপ সৌন্দর্য আর অসাধারণ সুলক্ষণযুক্ত দেখেই এক মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে সুনন্দাকে রায়বাড়ির বধূ করে এনেছিলেন স্বর্গত পরমেশ্বর রায়। সর্বেশ্বরও তরুণ মনের সবখানি ভালবাসা দিয়েই তাকে বরণ করে নিয়েছিল। পূর্ণ চাঁদের পূর্ণিমা তিথি সেদিন নেমে এসেছিল তাদের মিলিত জীবনে। শুধু হাসি আর গান। শুধু সোনালি দিন আর আলো ঝলমল রাত।

তারপর এল সেই ভয়ংকর রাত!

উঃ! সে রাতের ছবি আজো সর্বেশ্বরের চোখের সামনে ভাসে। আজো অনেক রাতে কাণে বাজে সুনন্দার সেই আর্ত কণ্ঠস্বর: রাণী—আমার রাণী—

অসহ্য আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেছে তার কণ্ঠনালী। আপ্রাণ চেষ্টা করছে চীৎকার করতে। কিন্তু একটাও শব্দ বের হচ্ছে না কণ্ঠনালী দিয়ে। শুধু থর্ থর্ করে কাঁপছে তার ক্লিষ্ট দেহ। অদ্ভুতভাবে আকুঞ্চিত হচ্ছে দেহের শিরা-উপশিরা। অর্থহীন ভাবে ভীতি-বিস্ফারিত হচ্ছে চোখের দুটি অক্ষি-গোলক।

হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে সুনন্দা মুর্ছিতা হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

আর সেই রাতেই—

নাঃ, আর ভাবতে পারে না সর্বেশ্বর। সুনন্দার সেই বিকৃত মুর্ছিত দেহের কথা মনে হলে আজো তার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে।

কপালের রগদুটোকে চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল সর্বেশ্বর। ক্লান্ত পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে তাকাল বাইরে।

রাত শেষ হয়ে এসেছে।

দূরের শালবন থেকে ভেসে আসছে পাখির প্রভাতী কাকুলি।

দূরদিগন্তের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সর্বেশ্বর। তারপর এক সময় ধীর পায়ে টানা বারান্দা পার হয়ে হলঘরে ঢুকল।

হলঘরের একপাশে দেয়ালের গা ঘেঁসে একটা ছোট খাট। আগাগোড়া বাঘের চামড়া মোড়া। রাজা শিবশেখরেশ্বর রায় নিজের হাতে বাঘ শিকার করে তার চামড়া দিয়ে ওই শয্যাটি বানিয়েছিলেন শখ করে। কখনো কখনো ওই শয্যাতেই রাত কাটাতেন তিনি।

শয্যাটিকে এমন ভীতিপ্রদ করে তৈরী করবার আরো একটা কারণ ছিল।

ওই শয্যাসংলগ্ন দেয়ালেই রয়েছে পাতাল ঘরের গুপ্ত দ্বারের সংকেত।

সর্বেশ্বর এগিয়ে যেয়ে সেই শয্যার শিওরে দাড়িয়ে দেয়ালে বসানো বাঘের মাথাটা সরিয়ে নিতেই ছোট তামার হাতল দেখা দিল। অনেকটা দেয়ালে লাগানো হুকের মত দেখতে।

দৃঢ় হাতে সেই হাতলে চাপ দিল সর্বেশ্বর!

অমনি সেই হলঘরের এক কোণের মেঝেয় একটা পাথরের চৌকো দরজা দেখা দিল।

বাঘের মাথাটাকে যথাস্থানে বসিয়ে সর্বেশ্বর গুপ্ত দরজার মুখে যেয়ে দাঁড়াল।

দরজার নিচে গাঢ় অন্ধকার। ভাল করে দৃষ্টি ফেললে দেখা যায় অনেক নিচ থেকে উঠে আসছে আলোর একটা ক্ষীণ শিখা। আরো দেখা যায় সেই অন্ধকার দ্বারপথের নিচ থেকে খাড়া নেমে গেছে অনেক—অনেক সিঁড়ি। একেবারে পাতাল পর্যন্ত বুঝি প্রসারিত।

থমকে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল সর্বেশ্বর। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল। আর এমনি আশ্চর্য নির্মাণ কৌশল সেই গুপ্ত সিঁড়ির যে তাতে পা রাখবা মাত্রই মাথার উপরে সুড়ঙ্গ-পথের দরজা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

নিচের দিকে একবার কাণ পাতল সর্বেশ্বর।

না, কোন শব্দই কাণে আসছে না—না উন্মাদের অট্টহাসি, না ব্যথিতের আর্তনাদ।

খুব সতর্ক হয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল সর্বেশ্বর।

সর্বশেষ সিঁড়ি শেষ হল পাতাল ঘরে।

পাতাল ঘর।

একমাত্র সিঁড়ির মুখ ছাড়া আর সব দিক থেকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ মাঝারি আয়তনের ঘর। একটা মানুষের নাগালের চেয়ে উঁচুতে ছাদ থেকে ঝোলানো একটা কাঁচের লণ্ঠনের ভিতরে টিম টিম করে জ্বলছে মোমবাতি। তারি অনুজ্জ্বল আলোয় আবছা দেখা যায় ঘরখানার চেহারা। এককোণে জলের কুঁজো ও গ্লাস। তার পাশে থালা-বাটি সাজানো। অন্যদিকে ছোট একখানা খাট পাতা।

সেই খাটে বিসদৃশ ভঙ্গীতে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে একটি স্ত্রীলোক। খাটের পায়ের দিকে মেঝেয় দুই হাঁটুর উপর মাথা রেখে বসে আছে একটি বৃদ্ধা।

সর্বেশ্বর খাটের দিকে এগিয়ে যেতেই চমকে মাথা তুলল বৃদ্ধা। ভীত ত্রস্তভাবে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে বলে সর্বেশ্বর খাটের পাশে যেয়ে দাঁড়াল। একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল ঘুমন্ত নারীমূর্তির দিকে। সমবেদনায় ও সহানুভূতিতে ছল্‌ছল্‌ করে উঠল তার দুটি চোখ। বুকের ভিতর জাগল অবরুদ্ধ বেদনার কল্লোল-ধ্বনি।

কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। ইঙ্গিতে বৃদ্ধাকে চুপ করে থাকতে বলে সতর্ক পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল সর্বেশ্বর।

সিঁড়ির মাথায় তামার হাতলটা ঘুরিয়ে দিতেই খুলে গেল সুড়ঙ্গ পথের দরজা। দরজা দিয়ে হলঘরে ঢুকে বাঘের মাথাটা সরিয়ে হাতলটা ঘুরিয়ে দিতেই গুপ্ত দরজা অদৃশ্য হয়ে গেল। পাতাল ঘর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল রাজবাড়ির সাতমহলা বাড়ি থেকে। মেঝেয় আঁকা সাদা-কালো পাথরের আলপনা ছাড়া গুপ্ত দরজার কোন চিহ্নই রইল না কোথাও।

হলঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল সর্বেশ্বর।

ভোরের আলো তখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বারান্দার বড় থামটার আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে সর্ব, এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলি রে?

পিসিমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে সর্বেশ্বর জবাব দিল, পাতাল ঘরে।

ওঃ, বলে পিসিমা চুপ করলেন। একটু পরে বললেন, আমি ঠাকুরঘরে চললাম। হাত-মুখ ধুয়ে তুই একবার ঠাকুর প্রণাম করতে আসিস। কথা আছে।

পিসিমা দ্রুত পদক্ষেপে পাশের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তার দিকে খানিক চেয়ে থেকে সর্বেশ্বর সেখানেই একটা সোফায় গা এলিয়ে দিল।

ঠাকুর পূজা শেষ করে ফিরে দাঁড়াতেই পিসিমা দেখলেন, সর্বেশ্বর দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠের পাশে। এগিয়ে এসে পিসিমা বললেন, কতক্ষণ এসেছিস সর্ব ?

সর্বেশ্বর হেসে বলল, এই একটু আগে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার পূজো দেখছিলাম। আচ্ছা পিসিমা, তুমি তো মনপ্রাণ ঢেলে দাও ঠাকুরের পায়, কিন্তু ঠাকুর কি তোমার দিকে ফিরে চায় ?

পিসিমা ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললেন, চায় কি না চায় সে বিচার তোকে করতে হবে না। এখন চল্ আমার ঘরে।

সর্বেশ্বরের জবাবের অপেক্ষা না করেই পিসিমা পা বাড়িয়ে দিলেন। সর্বেশ্বরও তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকল।

ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সহসা আর্তকণ্ঠে পিসিমা বলে উঠলেন, তুই এর একটা বিহিত কর সর্ব। এ আর আমি সইতে পারছি না।

যেন কিছুই বুঝতে পারেনি এমনি ভান করে সর্বেশ্বর বলল, কি হয়েছে পিসিমা ? কিসের বিহিত করব ?

—দেখ সর্ব, সব জেনে শুনেও এমন না জানার ভান তুই করিস নে। তুই কি মনে করিস, তোর মনের গভীর দুঃখের কথা আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না ?

—তুমি সব জান পিসিমা, সব বোঝ। তবু জেনে শুনে এমন অবুঝের মত কথা কেন বলছ ? তুমি কি জান না যে এ সব বিহিতের বাইরে।

—না, বিহিতের বাইরে নয়। শুধু তুই একটু শক্ত হলেই হয়।

—শক্ত ? একটুখানি ম্লান হাসি হাসল সর্বেশ্বর। তারপর বলল, বেশ, শক্তই হব। বল কি করতে হবে ?

দাঁতে দাঁত চেপে পিসিমা শক্ত গলায় বললেন, ওকে এখান থেকে অনেক দূরে কোথাও সরিয়ে দে।

আঁতকে উঠল সর্বেশ্বর, তুমি বলছ কি পিসিমা? সমাজ থেকে, সংসার থেকে, স্বামী-সন্তানের কাছ থেকে এক অন্ধকূপে তো তাকে সরিয়ে দিয়েছি। আরো কতদূরে কোথায় তাকে সরিয়ে দিতে বল তুমি?

এ প্রশ্নের কোন জবাব পিসিমার মুখ থেকে বেরুল না। মাথা নিচু করে চুপ করে রইলেন। একটু পরে সাহস সঞ্চয় করে আবার বললেন, বেশ, তাহলে ওর হাতে-পায়ে আগের মত শেকল লাগিয়ে দে।

আসন্ন সর্বনাশ যেন মাটি ফুঁড়ে ওর সামনে উঠে দাঁড়িয়েছে এমনি ভাবে চাপা আর্তনাদ করে উঠল সর্বেশ্বর, শেকল? তুমি বলছ কি পিসিমা? হাতে-পায়ে শেকল বাঁধলে ওর যে হিংস্র উন্মত্ত চেহারা হয় সে কি তুমি নিজের চোখে দেখনি? নিজের হাতের শেকলে মাথা খুঁড়ে ও মরে যাক এই কি তুমি চাও?

পিসিমাও যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন। তিনিও বললেন, আর ওর খোলা হাতের আগুনে তুই পুড়ে মরবি, তাই কি আমাকে চোখ মেলে দেখতে বলিস তুই?

—আগুন! তোমরা দেখতে পাওনা তাই। নইলে আগুন তো দিনরাতই আমাকে ঘিরে রয়েছে পিসিমা। ও আগুন আমার কপালে লেখা ছিল, তুমি আমি চেষ্টা করলেই কি তা খণ্ডাতে পারব?

—কিন্তু তোর এই অসহায় অবস্থা যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না সর্ব।

সর্বেশ্বর কি যেন ভাবল একটু সময়। তারপর বলল, আচ্ছা পিসিমা, তুমি কিছুদিন না হয় কাশী থেকে ঘুরে এস না।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঘুরে দাঁড়ালেন পিসিমা। আহত কণ্ঠে বললেন, কি বললি সর্ব? কাশী? তুই কি ভেবেছিস আমার নিজের সুখের জন্যই এই ভোর সকালে জোড় হাত করে তোর কাছে আমি আবেদন

জানাতে এসেছি ? বেশ, তাই যদি ভেবে থাকিস তবে সেই ব্যবস্থাই কর্। তোর ঘর-সংসার তুই বুঝে নে। আমাকে রেহাই দে। এ ভূতের বোঝা আমি আর বইতে পারছি না।

পিসিমা দুই হাতে মুখ ঢেকে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। অসহায় ভাবে এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে সর্বেশ্বর বলল, আমাকে তুমি ক্ষমা কর পিসিমা। আমার উপর তুমি রাগ করো না। এ ভূতের বোঝা তুমি না বইলে কে বইবে ? আমার আর কে আছে বল ?

মুহূর্তে জল হয়ে গেল সব অভিমান। সর্বেশ্বরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে পিসিমা বললেন, তুই ছাড়া আমারও যে আর কেউ কোথাও নেই রে। তাই তো তীর্থ-ধর্ম ছেড়ে তোকে আকড়েই পড়ে আছি। কিন্তু তোর এই ছন্নছাড়া সংসার যে আমি আর সত্যিই বইতে পারছি না রে।

সর্বেশ্বর মুখ তুলে বলল, সবই বুঝি পিসিমা। কিন্তু কি করব বল ? এর হাত এড়াবার কোন উপায়ও তো নেই। এ যে একেবারে ভগবানের মার।

—ভগবানের মার! তাই বটে। নিজের মনেই কথা বললেন পিসিমা, দেখ সর্ব, একটু আগেই তুই বলছিলি না, ঠাকুর আমার দিকে ফিরে চায় কি না ? সত্যি রে, আমারও মাঝে মাঝে সেই সন্দেহই হয়। নইলে ফুল-তুলসি তো তাঁর পায় অনেক দিলাম। কিন্তু কই, আমার সংসারের আগুন তো তাতে একটুও নিভল না।

এ আলোচনা চালাতে সর্বেশ্বরের আর ভাল লাগছিল না। একটা গভীর ক্লান্তি যেন তার সর্বশরীরে ছেয়ে আসছিল। তাই আলোচনার শেষ করবার জন্য সে বলল, দেখ পিসিমা, এ আগুন কেউ নেভাতে পারবে না। তুমি না, আমি না, এমন কি তোমার ঠাকুরও না। কাজেই এ নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা। তার চেয়ে বরং পাথরের

বারান্দায় চল। সেখানে এতক্ষণ হয়তো চা-টা তৈরী হয়ে গেছে।

—ইস্, তাই তো, কথায় কথায় আমার সে খেয়ালই ছিল না। কাল রাতে তোর ভাল ঘুম হয়নি। তুই এগো সর্ব। আমি রান্নার ব্যবস্থাটা করে দিয়েই আসছি।

—তাই এস।

সর্বেশ্বর দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। তার দিকে চেয়ে চেয়ে পিসিমার বুক থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল।

অনেক রাত।

নিজের ঘরে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে সুমিতা।

কিছুতেই ঘুম আসছে না। বিছানায় শুয়ে খানিক এ-পাশ ও-পাশ করে তাই উঠে পড়েছে। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে জ্যোৎস্না-ধোয়া দিগন্তের দিকে।

কাল শেষ রাতের ভৌতিক ঘটনার কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

অতি প্রাচীন রাজবাড়ি। রায়বংশের অনেক পুরুষের সুকীর্তি ও কুকীর্তির নীরব সাক্ষী। এর সঙ্গে একটা ভৌতিক রহস্য জড়িয়ে থাকা খুব অসম্ভব নয়। এমন কাহিনী সে শুনেছে। পুঁথি-পত্রেও পড়েছে।

কিন্তু সে ভৌতিক রহস্য কোন্ অজ্ঞাত কারণে একটি মানুষের প্রতি তীব্র জিঘাংসায় এমন উগ্র হয়ে উঠেছে তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

আর তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এত বড় একটা সম্ভাবিত দুর্ঘটনাকে নিয়ে কারো মনে কোন প্রশ্ন নেই, কোন উদ্বেগ নেই, কোন দুশ্চিন্তা নেই।

স্বয়ং সর্বেশ্বর—সামান্যতম অসতর্কতার ফলে যে কোন মুহূর্তে ওই ভৌতিক জিঘাংসার হাতে যার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে—সামান্য কয়েকটি হাল্কা কথা দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে কাল উড়িয়েই দিয়েছে। যেন অলীক একটা স্বপ্ন মাত্র দেখেছে সে, এমনি ভাব। আজও সারাদিনে কোন সময়ে তার চাল-চলনে আচার-ব্যবহারে মনে হল না যে এই ভৌতিক বিপদ সম্পর্কে তার মনে এতটুকু উদ্বেগ আছে।

এ কি করে সম্ভব?

নিজের জীবন সম্পর্কে এমন উদাসীন মানুষ কেমন করে হয়?

আজ রাতেও যদি সেই ভৌতিক আবির্ভাব ঘটে?

কথাটা মনে হতেই সুমিতার বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠল। সহসা মুখ ঘুরিয়ে নিজের ঘরের দরজাটার দিকে সে তাকাল।

দরজা বন্ধই আছে।

সর্বেশ্বরও কি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়েছে?

কথাটা মনে পড়তেই একটা দারুণ কৌতূহল জাগল সুমিতার মনে। সর্বেশ্বরের শয়নকক্ষ অর্গলবদ্ধ আছে কি না, আজ রাতেও সেই ভৌতিক মূর্তি তার ঘরে হানা দেবে কি না, জানবার জন্য সুমিতার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

পরক্ষণেই সে ভাবল, না না, তা হয় না। এখন গভীর রাত। এত রাতে এত বড় বাড়ির দুটো টানা বারান্দা পার হয়ে সর্বেশ্বরের শয়নকক্ষের সামনে তার যাওয়া চলে না। যদি কেউ দেখে ফেলে, এ কথা যদি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় তাহলে তার এ নৈশ অভিসারের কি কৈফিয়ৎ সে দেবে? তার এই সহজ কৌতূহলের যদি কেউ কদর্থ করে, তাহলে?

না না, সে হয় না। সেখানে তার যাওয়া চলে না।

কিন্তু মন যে মানে না। অনিশ্চিত রহস্যের প্রতি কৌতূহল বড়

ভীষণ জিনিষ। সুমিতা কিছুতেই সে কৌতূহলকে চাপা দিতে পারল না। একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে বারান্দায় পা দিল।

ভরা জ্যোৎস্নায় গোল গোল থামের টানা টানা ছায়া পড়েছে বারান্দায়। তারি ছায়ায় ছায়ায় লুকিয়ে অতি সতর্ক লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে চলল সে।

ও-পাশের টানা বারান্দার মোড় ঘুরেই থমকে সরে দাঁড়াল সুমিতা।

বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আছে সর্বেশ্বর। তার মুখের সিগারেটটা একবার জ্বলছে আর নিভছে।

বারান্দার কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুমিতা। তার তখন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে সর্বেশ্বরের নজরে পড়বার সম্ভাবনা। আবার চলে যেতেও পা সরছে না। এমন ভাবে খোলা বারান্দায় সারারাত লোকটা পড়ে থাকবে। কাল রাতের ভৌতিক জিঘাংসার ভয় ছাড়াও ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবার সম্ভাবনাও তো রয়েছে! অথচ সে কথা এই গভীর রাতে সুমিতা তাকে বলবেই বা কোন্ সাহসে?

এমন সময় সর্বেশ্বর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

চকিতে সুমিতা দেওয়ালের পাশে আরো একটু সরে গেল। নিজেকে সর্বেশ্বরের দৃষ্টি থেকে লুকোবার জন্যই সে সরে গেল। কিন্তু সুমিতা একটা কথা জানত না যে চাঁদের আলোয় তার একটা টানা ছায়া পড়েছে ওপাশের বারান্দায়। সে সরে যেতেই সেই ছায়াটাও একটু নড়ে গেল। আর সেটা আকস্মিকভাবেই সর্বেশ্বরের চোখে পড়ে গেল।

সর্বেশ্বর বিস্মিত হয়ে বলল, কে? কে ওখানে?

ধরা পড়ে গেছে সুমিতা। আর লুকোবার পথ নেই। কুণ্ঠিত

পায়ে একটু এগিয়ে এসে সে জবাব দিল, আমি—সুমিতা।

অধিকতর বিস্ময় ঝড়ে পড়ল সর্বেশ্বরের গলায়, আপনি? মিস্ রায়?

ঠোঁটের জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সুমিতার দিকে এগিয়ে গেল সর্বেশ্বর। বলল, এত রাতে আপনি এখানে—

কথাটা শেষ করল না সর্বেশ্বর। সুমিতা কৈফিয়তের সুরে বলল, আমি—মানে—কিছুতেই ঘুম আসছিল না, তাই বারান্দায় একটু পায়চারি করতে করতে—

কথাটা শেষ করল সর্বেশ্বর, এখানে এসে পড়েছেন, এই তো? কিন্তু ওটা আপনার বানানো কৈফিয়ৎ মিস্ রায়।

চমকে উঠল সুমিতা, মানে—আপনি—

—হ্যাঁ, আপনার এখানে আসার আসল কারণটা আমি জানি। দেখুন মিস রায়, এত বড় জমিদার বংশে জন্মেও আজ পর্যন্ত অনেক দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়েই আমাকে পথ চলতে হয়েছে। তাই আর কিছু শিখি আর না শিখি মানুষের মনের ভাষাটা আমি পড়তে শিখেছি।

সুমিতা শক্ত গলায় বলে উঠল, বেশ, শিখেই যদি থাকেন, বলুন কি আমার মনের ভাষা?

মৃদু হেসে সর্বেশ্বর বলল, দেখুন, সব কথা সোজাসুজি বলাই আমার স্বভাব। তাই হয়তো আমার কথায় আপনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, কাল রাতের ভৌতিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশংকাই কি এত রাত্রে আপনাকে টেনে আনে নি এখানে?

মাথা নীচু করে সুমিতা জবাব দিল, আপনি ঠিকই বলেছেন, মনের এ আশংকাকে আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারি নি। আমার এ অন্যায় কৌতূহলকে আপনি ক্ষমা করুন।

—এইবার আপনি সত্যি আমার প্রতি অন্যায় করলেন মিস রায়। একটি ভাগ্যহীন মানুষের জন্য আপনার মন স্নেহে ও সহানুভূতিতে

ভরে উঠেছে, এতো আমার কাছে পরম সৌভাগ্যের কথা। ক্ষমা করবার প্রশ্ন এখানে ওঠে কেমন করে? বরং আপনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আমারি মন ভরে ওঠা উচিত।

—না না, এতে কৃতজ্ঞতার কি আছে। এতো প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য। তাছাড়া আপনি আমার অন্নদাতা।

—অন্নদাতা! তা বটে।

একটু চুপ করে থেকে সর্বেশ্বর আবার বলল, কিন্তু মানুষের কর্তব্যের কথা বলছিলেন না মিস রায়? বলতে পারেন, পৃথিবীতে কটা মানুষ মানুষের কর্তব্য করে?

সুমিতা কোন জবাব দিল না। চুপ করে রইল।

আবার কথা বলল সর্বেশ্বর, দেখুন মিস্ রায়, এই জীবনে অনেক মানুষ তো দেখলাম, কিন্তু কোথাও দেখতে পেলাম না মানুষের মুখ, সবই শুধু মুখোস।

নিজের অজ্ঞাতেই সুমিতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, শুধুই মুখোস?

প্রশ্ন শুনে একটু যেন অপ্রতিভ হল সর্বেশ্বর। পরমুহূর্তেই বলল, না, শুধুই মুখোস নয়। একটি দুটি মুখও আছে। কিন্তু সে মুখের দেখা যে কদাচিৎ মেলে মিস্ রায়।

এরপর যেন দুজনই কথা হারিয়ে ফেলল। কথার খেলা খেলতে খেলতে নিজেদের অজ্ঞাতেই দুজন যেন এসে দাঁড়িয়েছে একটা অতল-স্পর্শ অন্ধকার গহ্বরের সামনে। আর পদক্ষেপের তিলমাত্র স্থান সেখানে নেই।

খানিক পরে সর্বেশ্বর বলল, রাত অনেক হল। এবার আপনি শুতে যান মিস্ রায়।

—হ্যাঁ যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করব।

—বলুন।

—নিজের সম্পর্কে আরো একটু সতর্ক হয়ে চলবেন। রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করে শোবেন।

হেসে উঠল সর্বেশ্বর, ওহো, কাল রাত্রের সেই ভূত দেখছি আপনার ঘাড় থেকে এখনো নামে নি।

—কথাটাকে আপনি হেসে উড়িয়ে দেবেন না। ভেবে দেখুন তো, আর একটু হলেই কি ভয়ানক বিপদ কাল ঘটতে পারতো।

—তা অবশ্যি ঘটতে পারতো। তবে কি জানেন মিস্ রায়, ও ভূতের আবির্ভাব আমার জীবনে এই প্রথম নয়। ও ভূতকে আমি চিনি।

—বলেন কি? তবু আপনি এই বাড়িতে বাস করেন?

—হ্যাঁ, চিনি বলেই তো বাস করি।

—বুঝতে পারলাম না তো।

—দেখুন মিস্ রায়, সব কথা আপনাকে বোঝানো সম্ভব নয়। তবে এইটুকু শুধু জেনে রাখুন যে, এ ভূত আর যাই করুক আমার কোন ক্ষতি কখনো করবে না।

—কিন্তু কাল রাতে সে তো আপনার মশারীতেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

—তা দিয়েছিল। তবে আমার কি মনে হয় জানেন?

—কি?

—ওটা ভূতের ভুল হয়েছিল। আসলে ও আগুন ধরাতে চেয়েছিল আপনার মশারীতে।

—আমার মশারীতে? কিন্তু কেন? আমার সঙ্গে ভূতের কি সম্পর্ক? আমি তো এ বাড়িতে আগন্তুক।

—ওটা মানুষের লজিকের কথা হল। ভূতেরও তো একটা লজিক থাকতে পারে। কিন্তু সে কথা থাক। এই গভীর রাত্রি

প্রেততত্ত্ব আলোচনার সময় নয়। আপনি এবার শুতে যান।

—কিন্তু আমার অনুরোধটা?

মৃদু হেসে সর্বেশ্বর বলল, হয় তো আপনার এ অনুরোধ রক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবু শুধু আপনার অনুরোধ বলেই আমি তা রক্ষা করব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে শুতে যান।

সুমিতা তবু নড়ল না। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

সর্বেশ্বর আবার বলল, আরো একটা কথা। আমার সম্পর্কে আপনি কতটুকু জেনেছেন আমি জানি না। আমার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে আপনার কি 'রিডিং' তাও আমি জানি না। তাই একটা কথা আপনাকে বলতে চাই। স্নেহ, ভালবাসা মানুষের জীবনে বড়ই দুর্লভ বস্তু মিস্ রায়। তাই তাকে অবহেলা করবার মত অমানুষ আমি নই।

গভীর আবেগের সঙ্গে কথা কয়টি বলেই সর্বেশ্বর হন্ হন্ করে নিজের শোবার ঘরের দিকে চলে গেল।

পাষাণ-মূর্তির মত সেখানেই খানিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুমিতা। তার বুকের প্রতিটি উত্থান-পতনের সঙ্গে বাজতে লাগল সর্বেশ্বরের আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর! রক্তে রক্তে জাগল তার প্রতিধ্বনি।

গভীর রাত্রির সেই নিস্তব্ধ প্রহরে আলো-আঁধারির আলপনা আঁকা রাজবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুমিতা যেন সানন্দ বেদনার সঙ্গে অনুভব করতে লাগল, ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, ধাপে ধাপে রূপান্তরিত হচ্ছে তার সত্ত্বা। সুমিতা বদলে যাচ্ছে তার চোখের সম্মুখে। পরমুহূর্তেই দুই হাতে চোখ ঢেকে টলতে টলতে সে ছুটতে লাগল নিজের ঘরের দিকে।

পশ্চিম আকাশে তখন হেলে পড়েছে নিস্তব্ধ রাত্রির নীরব সাক্ষী কালপুরুষ নক্ষত্র। জ্বল জ্বল করছে তার তৃতীয় নয়ন।

॥ ৮ ॥

বহুদূর পর্যন্ত সরল রেখায় বিস্তৃত কোন রেলপথের উপরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালে দেখা যায় দুটি লৌহবর্ত্ম সমান্তরালভাবে চলতে চলতে ক্রমশঃ পরস্পরের কাছাকাছি এগিয়ে আসছে।

অবশ্য গণিতবিজ্ঞানের বিধান বলে, দুটি সমান্তরাল রেখা কখনও একত্র মিলিত হতে পারে না।

কিন্তু গণিত বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য। একের বিধানে যা সম্ভব নয়, অপরের বিধানে তাই স্বাভাবিক পরিণতি। দুটি হৃদয় পাশাপাশি চলতে চলতে ক্রমশঃ কাছাকাছি এগিয়ে আসে। তারপর হয়তো একদিন মিলেও যায় এক হয়ে।

প্রায় মাস দেড়েক পরের কথা।

সেদিনও যথারীতি প্রাতঃকালীন চায়ের জন্য সবাই হাজির হয়েছে পাথরের বারান্দায়। সেই সকালেই স্নান সেরে পিঠের উপর ভিজে চুলের রাশ ছড়িয়ে দিয়ে সুমিতাও হাজির হয়েছে।

চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল গদাধর। নিত্যকার অভ্যাসমত চায়ের কাপ সাজাতে যেতেই সুমিতা বলে উঠল, তুমি তোমার কাজে যাও গদাধর, চাটা আমিই তৈরী করছি।

গদাধর হাত ফিরিয়ে এনে পিসিমার দিকে চাইল। পিসিমা বললেন, সে তো খুব ভাল কথা মা। রোজ যদি তুমি চাটা কর তাহলে

তো খুব ভালই হয়। তুমি তো জান না মা, চা খাওয়া নিয়ে এক সময় সর্ব কি রকম খুঁতখুঁতে ছিল।

গদাধর হাসি মুখে চলে গেল।

সর্বেশ্বর ইজিচেয়ারে শুয়ে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, তোমার ও পুরনো কথাগুলো তুমি বন্ধ কর তো পিসিমা।

তিন কাপ চা তৈরী করে সুমিতা নিজেই চেয়ার ছেড়ে এক কাপ রাখল সর্বেশ্বরের ইজিচেয়ারের পাশের টিপয়ের উপর।

পিসিমা বোধ হয় অন্যমনস্কভাবে কি ভাবছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হতেই বললেন, ওই যা, তোমাকে তো বলে দেওয়া হয়নি মা, সর্ব আবার চায়ে কম চিনি খায়।

ইন্দ্রানীর চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে সুমিতা বলল, সে আমি জানি। গদাধর বলেছে আমাকে।

—তাই নাকি ? বলে মিষ্টি হাসলেন পিসিমা।

সর্বেশ্বর চায়ের কাপটা নামিয়ে একবার চাইল সুমিতার দিকে। তারপর আবার কাপটা তুলে নিল।

এমন সময় সিঁড়ির নিচ থেকে কে যেন ডাকল, বাবু—

সর্বেশ্বর বলল, কে ?

—আজ্ঞে, আমি সদানন্দ।

—ওঃ, সরকারমশাই। আপনি এখানেই আসুন।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল একজন আধবুড়ো লোক। সসম্ভ্রমে নমস্কার করে বিনীতভাবে এক পাশে দাঁড়াল।

—কি খবর সরকারমশাই ?

—আজ্ঞে, রমানাথবাবু এসেছেন নিচে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—কে ? রমানাথবাবু ?

একটা বিষাক্ত সাপ যেন হঠাৎ উদ্যত ফনা বিস্তার করে দাঁড়িয়েছে সামনে এমনি ভাবে আঁতকে উঠল সর্বেশ্বর।

তার চেহারা ও কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক পরিবর্তন সুমিতার দৃষ্টি এড়াল না। নিজের সম্ভাবিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও যে মানুষ অবিচল অকম্পিত কণ্ঠে কথা বলতে পারে, তার এই আকস্মিক অধৈর্যের কারণ কি? কে এই রমানাথবাবু?

পিসিমার মুখেও বিরক্তির ছায়া। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, রমানাথ! আবার কি জন্যে এসেছেরে তোর কাছে?

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সর্বেশ্বর বলল, কেমন করে বলব বল? অনেকদিন তো দেখা সাক্ষাৎ নেই। চলুন সরকারমশাই, আমিই যাচ্ছি নিচে।

ইন্দ্রাণী বলল, মামাবাবু এসেছে, না বাবু? নিশ্চই আমার জন্যে অনেক লজেঞ্চুশ এনেছে। আমি তোমার সঙ্গে নিচে যাব বাবু?

সর্বেশ্বর বলল, না মা, আমার সঙ্গে হয় তো কোন জরুরী কাজ আছে। কাজ সেরে তাকে উপরে পাঠিয়ে দেব। তখন অনেক আলাপ করো মামাবাবুর সঙ্গে। কেমন?

ঘাড় নেড়ে সায় দিল ইন্দ্রাণী। সর্বেশ্বর সরকারমশাইর সঙ্গে নিচে নেমে গেল।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

সুমিতাই প্রথম কথা বলল, রমানাথবাবু কি রাণীর আপন মামা?

পিসিমা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। সুমিতার প্রশ্নে সচকিত হয়ে বললেন, না, এমনি গ্রাম সম্পর্ক আর কি।

সম্পর্ক যে খুব ঘনিষ্ট নয় সে সন্দেহ সুমিতারও হয়েছিল। সে আরও বুঝতে পেরেছে যে, এই রমানাথবাবু লোকটি এ বাড়িতে খুব অভিপ্রেত অতিথি নয়। এর উপস্থিতিতে সবাই বিরক্ত হয়েছে।

কিন্তু কেন? গ্রাম সম্পর্ক হলেও সর্বেশ্বরের শ্বশুরবাড়ির দেশের

লোক এই রমানাথ। অথচ তার উপস্থিতির সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কেন এমন ভাবে আঁতকে উঠল সে ?

তবে কি ?

সন্দেহের একটা কালো ছায়া হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল সুমিতার মনে। তবে কি শ্বশুরবাড়ির সম্পর্ক নিয়ে কোনরূপ তিক্ততা আছে সর্বেশ্বরের মনে ? তাই কি নিজের জীবন ও সংসার সম্পর্কে এমন উদাসীন বীতস্পৃহ সে ?

কিন্তু তার প্রশ্নের জবাবে সামান্য দুটি কথা বলেই পিসিমা চুপ করে গেলেন। মনে হল এ প্রসঙ্গে কোন আলোচনা করতে তিনি চান না। তাই মনের কৌতূহল মনে চেপেই সুমিতা চুপ করে রইল।

সে কৌতূহল উগ্রতর হল আরো কিছুক্ষণ পরে।

বারান্দা দিয়ে কি একটা কাজে যেতে যেতে সুমিতার কাণে এল, সর্বেশ্বরের শোবার ঘরে উচ্চকণ্ঠে কিসের যেন বাদানুবাদ চলেছে।

যেতে যেতেই একটু কাণ পাতল সুমিতা।

একটি কণ্ঠস্বর সর্বেশ্বরের। অন্যটি নিশ্চয়ই রমানাথবাবুর। সেই কণ্ঠস্বরটিই উচ্চতর।

বিস্মিত হল সুমিতা। সর্বেশ্বর স্বভাবতই স্বল্পভাষী। তাছাড়া সে কথা বলে নিম্ন কণ্ঠে। উত্তেজনার কি এমন কারণ ঘটল যে তারও কণ্ঠ এমন অস্বাভাবিক স্তরে উঠে গেল ?

আলোচনার বিষয়বস্তু কিছুই সুমিতা বুঝতে পারল না। আর এ অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না। সুমিতা যেমন যাচ্ছিল ধীর পায়ে তেমনি কাজে চলে গেল।

সেই রাত্রে ঘটল এক বিস্ময়কর কাণ্ড। যেমন লোমহর্ষক তেমনি অচিন্তনীয়। যেন কোন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের একটি অধ্যায় সহসা বইয়ের পাতা থেকে উড়ে এসে রাজবাড়ির রঙ্গমঞ্চে সাড়ম্বরে

অভিনীত হয়ে গেল। সে অভিনয় প্রত্যক্ষ করে সুমিতা ভীত হল, বিস্মিত হল, রোমাঞ্চিত হল। শুধু তাই নয়, অভিনয় দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময়ে নিজেই নাটকের একটি মূল চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

আশ্চর্য !

অথবা আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। জীবন উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর।

গভীর রাত।

নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছে সুমিতা।

একটা ভীষণ চীৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, দূরে কোথাও মৃত্যু-যন্ত্রণায় কে যেন আর্তনাদ করে উঠল।

গভীর আতংকে বিছানায় উঠে বসল সুমিতা। কাণ পাতল সেই চীৎকার আবার শোনবার জন্য। শুধু বুঝি শোনা গেল দ্রুত পদক্ষেপের ধ্বনি। কোন চীৎকারের শব্দ আর ভেসে এল না।

বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল সুমিতা।

আবার কি সেই ভৌতিক ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে ?

একবার কি দেখে আসবে সে সর্বেশ্বর সুস্থ আছে কি না ?

একটা কর্কশ শব্দ ভেসে এল বাতাসে।

শব্দ অনুসরণ করে মুখ তুলে তাকাল সুমিতা। আবার সেই কর্কশ শব্দ।

কোথায় যেন একটা পেঁচা ডাকছে। তারই কর্কশ শব্দ অন্ধকারে ভেসে আসছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সুমিতা। বৃথাই সে এতটা ভয় পেয়েছিল। জীর্ণ ফাঁটলধরা এই বাড়ির ভূত দেখছি তার ঘাড়েও চেপে বসেছে।

মৃদু হেসে নিজের ঘরে যাবার জন্য পা বাড়াল সুমিতা।

পা বাড়িয়েই থমকে দাঁড়াল। অন্ধকার বারান্দার মোড় ঘুরে পা ফেলে কে যেন তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

এ কি?

চমকে উঠল সুমিতা। এ যে সর্বেশ্বর।

কাছে এসে সর্বেশ্বর বলল, এ কি? মিস্ রায়, আপনি এখানে?

সুমিতা লক্ষ্য করল, গভীর উত্তেজনায় দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে সর্বেশ্বরের। কেমন যেন হাঁপাতে হাঁপাতেই কথা কটি বলল সে।

সুমিতা বলল, হ্যাঁ, একটা পেঁচার ডাক শুনে কেমন খটকা লেগেছিল, তাই—

—পেঁচার ডাক?

—হ্যাঁ। ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল। সেদিনের ছায়ামূর্তির কথা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম। কি করব ভাবছি, এমন সময় কোথায় যেন একটা পেঁচা ডেকে উঠল। নিজের ভুল বুঝতে পারলাম।

—ভুল নয় মিস্ রায়, আপনি ঠিকই শুনেছেন। ওটা পেঁচার ডাক নয়, আর্তনাদ।

—তার মানে? সেই ছায়ামূর্তি কি তাহলে আজও এসেছিল?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই?

—বলেন কি? আপনার কোন ক্ষতি?

—না, আমার কোন ক্ষতি হয় নি। আপনাকে তো সেদিনই বলেছি মিস্ রায়, এ ছায়ামূর্তি জ্ঞাতসারে কখনো আমার কোন ক্ষতি করবে না।

—আপনি কি বলছেন? একটা ভৌতিক ছায়ামূর্তি গত জীবনের কোন ভীষণ অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য রাতের অন্ধকারে হানা দেয় রাজবাড়ির ঘরে ঘরে, আর সেই রাজবাড়ির একমাত্র মালিক হয়েও এমন নিশ্চিন্তে এ কথা আপনি বলছেন কোন্ ভরসায়?

—আমি ঠিকই বলছি মিস্ রায়। কিন্তু সে কথা আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। ও কথা থাক, আসুন আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

—ছায়ামূর্তির কীর্তি দেখতে।

—আপনার কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমার সঙ্গে গেলেই বুঝতে পারবেন। তাছাড়া আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম।

—আমার কাছে ?

—হ্যাঁ। একটা লোক গুরুতর আহত হয়েছে। অবিলম্বে ফার্স্ট-এইড দরকার। হাসপাতাল এখান থেকে অনেক দূর। আমি নিজে ও বিদ্যার কিছুই জানি না। আপনি শিক্ষিত, আধুনিক মহিলা। আশা করি মোটামুটি ফার্স্ট-এইড—

—ঠিক আছে। আপনি চলুন। আমার সাধ্যমত আমি চেষ্টা করব।

—আসুন।

সর্বেশ্বর ও সুমিতা দ্রুত পা ফেলে অন্ধকার বারান্দার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাড়ির একেবারে পূবদিক ঘেঁসে রাজবাড়ির সুসজ্জিত প্রশস্ত হলঘর। সেই ঘরের দরজায় এসে মৃদু করাঘাত করল সর্বেশ্বর। ভিতর থেকে আওয়াজ এল, কে ?

চাপা গলায় সর্বেশ্বর বলল, গদাধর, দরজা খোল।

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল গদাধর। ঘরে ঢুকল সর্বেশ্বর ও সুমিতা। গদাধর আবার দরজায় খিল এঁটে দিল।

ঘরে পা দিয়েই সুমিতা বুঝতে পারল, এ বাড়িতে পা দিয়ে এই ঘরেই সে প্রথম ঢুকেছিল। দেয়ালের গায়ে ফ্রেমে বাঁধানো বড় বড়

তৈলচিত্র। বাঘ, ভালুক, হরিণের মাথা। মাথার উপরে অনেকগুলো ঝাড়-লণ্ঠন।

বিছানার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সর্বেশ্বর বলল, ওই আপনার রুগী। দেখুন কতদূর কি করতে পারেন।

কয়েক পা এগিয়েই সুমিতা চাপা গলায় বলে উঠল, এ কি? রক্তে যে একেবারে ভিজে গেছে সব। কি করে হল?

—সে অনেক কথা। পরে শুনবেন। আগে দেখুন রুগীর অবস্থা কেমন।

সুমিতা আহত লোকটির পাশে যেয়ে বসল। গায়ের চাদরটা সরিয়ে দিল।

উঃ, কি নৃসংশ আক্রমণের চিহ্ন লোকটির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে। বুকে গলায় মাথায় নির্বিচারে আঘাত চালিয়েছে কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে।

আজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে লোকটি। মুখ দিয়ে শুধু গোঙানির শব্দ হচ্ছে। হাত-পা সব নিথর হয়ে পড়ে আছে।

সুমিতা মুখ তুলে তাকাতেই সর্বেশ্বর পাশের টেবিল থেকে ফার্স্ট-এইডের বাক্সটা এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা আমার ঘরেই ছিল। আপনার দরকার হবে ভেবে এনে রেখেছি।

হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিয়ে সুমিতা বলল, ওটা আমাকে দিন। আঘাত গুরুতর। এখুনি হাসপাতালে একটা লোক পাঠান।

সর্বেশ্বর ইতস্তত করে বলল, পাঠাব?

সুমিতা লোকটির নাড়ি পরীক্ষা করতে করতে বলল, হ্যাঁ, এখুনি পাঠান। দেরি করলে একে বাঁচানো যাবে না।

—কিন্তু ডাক্তার আসতে অন্তত দুঘণ্টা সময় লাগবে। ততক্ষণ—

—ততক্ষণ আমিই যতটুকু যা পারি চেষ্টা করে দেখি।

গদাধরের সহায়তায় সুমিতা আহতের প্রাথমিক চিকিৎসার যত-

টুকু যা করা সম্ভব তা করল। কিন্তু লোকটিকে বাঁচানো গেল না। ডাক্তার আসবার অনেক আগেই তার মৃত্যু হল।

সেই রাতের অন্ধকারেই গদাধর চুপি চুপি বাইরে যেয়ে আরো দুটি জোয়ান লোককে নিয়ে এল ঘরে। তারপর বাড়ির অন্য সকলের অজ্ঞাতে আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা মৃতদেহটিকে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে সুমিতা নীরবে সব দেখল। একেবারে প্রথমেই একটা সন্দেহ বুঝি ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তার চোখে। সর্বেশ্বর ইঙ্গিতে তাকে চুপ করে থাকতে বলে অনুনয়ের সুরে বলেছিল, এখন আপনি কোন প্রশ্ন করবেন না। পরে আপনাকে সব বলব আমি।

তারপর রাজবাড়ির গাড়িতে চেপে হাসপাতালের ডাক্তারবাবু এল। নিজের আকস্মিক অসুখের কাল্পনিক বিবরণ শুনিয়ে একটা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখিয়ে নিল সর্বেশ্বর। মোটা ফি গুঁজে দিল তার পকেটে। খুশি হয়ে ডাক্তারবাবু বিদায় নিল।

সবই ঘটল সুমিতার চোখের সামনে। একটার পর একটা ঘটনার স্রোত এমন দুঃসহ আকস্মিকতায় বয়ে গেল যে সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে সুমিতা যেন খেই হারিয়ে ফেলল। একটা গভীর দুর্বোধ্যতার অন্ধকারে পথ হাতড়ে ঘুরতে লাগল তার মন।

কে এই লোকটি?

হঠাৎ এমন নৃসংশ ভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় কে একে আঘাত করল? কেন করল?

এও কি সেই ভৌতিক ছায়ামূর্তির কীর্তি?

এ কোন্ ভূতে পাওয়া সাংঘাতিক বাড়িতে সে আশ্রয় নিয়েছে?

রাতের অন্ধকারে কেন এর অলিন্দে অলিন্দে ঘুরে বেড়ায় রহস্যময় মৃত্যুর রক্তাক্ত নখর?

সুমিতা সব চেয়ে বিস্মিত হয়েছে সর্বেশ্বরের আচরণে। সেদিনকার অগ্নিকাণ্ড, কি আজকের হত্যাকাণ্ড—তার কাছে এ দুই-ই যেন সহজ স্বাভাবিক ঘটনা। এত বড় দুটি দুর্ঘটনার সামনেও তার কথায় বা ব্যবহারে এতটুকু চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার প্রকাশ নেই। তারই বাড়িতে গভীর রাতে একটা লোক খুন হল, মৃতদেহ সকলের অজ্ঞাতে সরিয়ে দেওয়া হল মাটির নিচে চাপা দিতে, অথচ সর্বেশ্বর সারাক্ষণ কথা বলল, কাজেব নির্দেশ দিল নিরুত্তেজ চাপা গলায়। এর অর্থ কি ? আর এ সম্ভবই বা হয় কেমন করে ?

ডাক্তারবাবুকে বিদায় দিয়ে সর্বেশ্বর যখন ফিরে এল, সুমিতা তখনো তেমনি চুপ করে বসে আছে সেই ঘরে। তার মনে অনেক ঘটনার জটিল জট।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বাতায়ন-পথে দেখা যায়, চক্রবালরেখায় উষার আসন্ন পদচিহ্ন।

ধীরে ধীরে সুমিতার কাছে এসে সর্বেশ্বর বলল, আপনি হয়তো হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন এ বাড়ির কাণ্ডকারখানা দেখে। না জানি, আমাদের সম্বন্ধে কি কুৎসিত ধারণা জন্মেছে আপনার মনে।

সুমিতা কোন কথা বলল না। একবার শুধু তাকাল মুখ তুলে।

সর্বেশ্বর আবার কথা বলল, অনেক কষ্ট আপনাকে দিয়েছি আজ। আরো একটু কষ্ট আপনাকে করতে হবে। এই শেষ রাতে আর নিশ্চয়ই আপনার ঘুম হবে না। আমার সঙ্গে একটু ছাদে চলুন। আমার কয়েকটা কথা আপনাকে বলবার আছে।

আজকের ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক প্রশ্নই জমা হয়ে ছিল সুমিতার মনে। বিনা বাক্যব্যয়ে সে উঠে দাঁড়াল। সর্বেশ্বরের পিছনে পিছনে রাজবাড়ির ছাদে উঠে গেল সে।

মস্ত বড় সমতল ছাদ। মাঝখানে দাঁড়ালে চারপাশের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

মাথার উপরে ভোরের আকাশে নির্জন শুকতারাটা তখনো জ্বল্ জ্বল্ করছে।

নিচে দাঁড়িয়ে আছে মাটির পৃথিবীর তুটি মানুষ। আর কেউ কোথাও নেই।

শুধু পুরনো বাড়ির এক কোণে একটা ফাঁটলের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটা বটগাছ। অনেক শাখা-প্রশাখা আর পত্র-পল্লবে ভোরের আবছা আলোয় গাছটাকে কেমন যেন ভূতুরে মনে হচ্ছে।

সহসা সুমিতার মনে হল, কাল রাতে পেঁচাটা বোধ হয় এই বটগাছের ডালে বসেই ডেকেছিল।

কথা বলল সর্বেশ্বর, দেখুন মিস্ রায়, যে কথাগুলো আপনাকে বলব তা যেমন রহস্যময় তেমনি ভয়ংকর। তবু ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এ বাড়ির সুখ-তুঃখের সঙ্গে আপনি যখন অনেকখানি জড়িয়ে পড়েছেন, তখন আজকের ভয়ংকর ঘটনাগুলোর কিছু কিছু ব্যাপার আপনাকে জানানো দরকার মনে করেই বলছি।

সর্বেশ্বর কথার মাঝখানে একটু থামল। সম্ভবতঃ কেমন করে আরম্ভ করবে তাই ভাবল একটু। সুমিতাও কোন কথা বলল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল সর্বেশ্বরের দিকে।

সর্বেশ্বর বলল আবার, যে লোকটা কাল রাতে মারা গেল সে রমানাথ।

—বলেন কি? ইন্দ্রাণীর মামা?

—হ্যাঁ। তবে আপন মামা নয়, গ্রাম সম্পর্ক মাত্র।

—তা জানি। কিন্তু কে তাকে মারল এমন নৃসংশভাবে?

—ছায়ামূর্তি।

সুমিতার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হল। সন্দিগ্ধকণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, আপনি কি করে বুঝলেন যে এটা ছায়ামূর্তির কাজ?

—আমি নিজের চোখে সেই ছায়ামূর্তিকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি হলঘর থেকে।

সন্দেহ ঘনীভূত হল সুমিতার মনে। এ কার সঙ্গে সে কথা বলছে? এ কি কোন প্রেতসিদ্ধ, না ভদ্রবেশী কোন শয়তান?

সোজা প্রশ্ন করল সুমিতা, কিন্তু আপনার শোবার ঘর তো হলঘর থেকে অনেক দূরে। তাহলে—

—দেখুন, এই রকম একটা দুর্ঘটনা আজ ঘটতে পারে এ আশংকা আমার মনে আগে থেকেই হয়েছিল। তাই নিজের ঘরে থাকলেও আমি জেগেই ছিলাম।

—আপনি বলছেন কি? ভৌতিক আক্রমণের কথা আপনি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন? আপনি কি প্রেতসিদ্ধ?

মৃদু হাসল সর্বেশ্বর। বলল, না, অতটা উন্নতি করতে পারিনি। প্রেতসিদ্ধিটিদ্ধি কিছুই আমি জানি না।

—তাহলে?

—দেখুন মিস্ রায়, কথাটা আপনাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। তবে একটা কথা জানবেন, আমাদের সাধারন বিচারবুদ্ধির বাইরেও মানুষের মনের এমন কতকগুলি শক্তি আছে যার বলে আসন্ন বিপদের একটা অস্পষ্ট আভাষ সে অনেক সময় বুঝতে পারে। এও অনেকটা সেই রকমেরই ব্যাপার। ইচ্ছা করলে কাব্য করে একে তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিও বলতে পারেন।

সুমিতা মরিয়া হয়ে উঠেছে। সর্বেশ্বরকে কেন্দ্র করে তার গোপন মনে যে স্বপ্নসৌধ গড়ে উঠেছে, তার স্বভাব ও চরিত্রের যে মধুর মূর্তি গড়ে উঠেছে, কাল রাতের এই ভয়ংকর ঘটনার আঘাতে তা যেন থরথর্ করে কাঁপছে। সেই সঙ্গে ব্যথায় টন্‌টন্ করছে তার মন।

এই রহস্যের অন্ধকারে সে আর থাকতে পারছে না। থাকতে চায় না। স্পষ্ট করে সে জানতে চায় এই মানুষটার স্বভাব ও স্বরূপ। সে চায় সত্যদৃষ্টি।

সুমিতা প্রশ্ন করল, বেশ, তাই না হয় মানলাম। কিন্তু এত বড় একটা ঘটনার আভাষ পেয়েও তার প্রতিকারের কোন চেষ্টা কেন করেন নি? কেন রমানাথবাবুকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করেন নি?

একটু চুপ করে থেকে সর্বেশ্বর বলল, দেখুন মিস্ রায়, আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাব শুনলে আপনি ব্যথা পাবেন—খুবই ব্যথা পাবেন। তবু সত্যি কথাই আমি বলব। সত্যি, রমানাথকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই আমি করিনি। ইচ্ছে করেই করিনি। আমার অবচেতন মন ওর মৃত্যুই কামনা করছিল অনেকদিন থেকে। তাই আকস্মিক যোগাযোগের ফলে সে সুযোগ যখন দেখা দিল তখন নিজ হাতে বাধা দিতে আমি পারি নি।

সুমিতা প্রশ্ন করল, কিন্তু কি এমন অন্যায় সে করেছিল যার জন্য আপনি তার মৃত্যু কামনা করছিলেন জানতে পারি কি?

সর্বেশ্বর সাগ্রহে বলল, নিশ্চয় পারেন মিস্ রায়। আর সেই কথা আপনাকে জানাতে চাই বলেই গভীর রাতে আপনার দরজায় গিয়েছিলাম আপনাকে আজকের ভৌতিক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী করতে। আর ঠিক সেই জন্যই আপনাকে ডেকে এনেছি এখানে। কিন্তু মিস্ রায়, সে কথা জানবার যে একটি সর্ত আছে। সে সর্ত মানতে কি আপনি রাজী আছেন?

সুমিতা সবিস্ময়ে বলল, কি সর্ত?

—এই রাজবাড়ির, এই রায়বংশের সে এক অতি গূঢ় গোপন কথা। রাজবাড়ির মান-সম্ভ্রম ও রায়বংশের সম্মান তার সঙ্গে জড়িত। তাই সে কথা শুধু একজনকেই বলা যায়। বলুন, সেই একজন আপনি হবেন?

চকিতে দু-পা সরে গেল সুমিতা। বজ্রাহতের মত প্রশ্ন করল, আপনি কি বলছেন ?

—যে কথা আমার একান্ত মনের তাই বলছি।

—কিন্তু এ যে অসম্ভব।

—কেন ? কেন অসম্ভব ? আমি কি এতই অযোগ্য মিস্ রায় ?

—না না, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। কিন্তু এ হয় না।

—কেন হয় না মিস্ রায় ? কিসের বাধা ?

সুমিতা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারল না। মুখ নিচু করে চুপ করে রইল।

কথা বলল সর্বেশ্বর, আমার মত হতভাগ্যের জন্য যে মমতা, যে দরদ আপনি দেখিয়েছেন, সে সবই কি তাহলে আমার ভুল দেখা ?

সুমিতা আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, না না, ভুল নয়। যা কিছু করেছি মনের তাগিদেই করেছি। কাউকে দেখাবার জন্য নয়।

—আমি জানি, আমি জানি মিস্ রায়। নইলে এত বড় কথাটা আপনাকে বলবার সাহস আমি পেলাম কোথায় ? সে সাহস যে আপনিই—

কথার মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠল সুমিতা, ও কথা থাক। আমি যাই।

—কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব তো পেলাম না। বলে যান কিসের বাধা ?

—ও প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না।

—জবাব যে আপনাকে দিতেই হবে মিস্ রায়। এ যে আমার জীবন-মরণের প্রশ্ন। আপনার একটি কথার উপর সব নির্ভর করছে। এই ভাগ্যহীন অভিশপ্ত জীবন আমি আর বইতে পারছি না।

সুমিতা মুখ তুলল কিছু বলবার জন্য। তার চোখে টলমল করছে অশ্রুর বিন্দু।

—এ কি আপনি কাঁদছেন?

—আমি যে দরিদ্র। আপনার আশ্রিত।

—এ আপনার ভুল ধারণা মিস্ রায়, আশ্রয় কেউ কাউকে দিতে পারে না। তাছাড়া, কে বলে আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি? আমি তো আশ্রয় পেয়েছি। সে আশ্রয় থেকে আপনি কি আমাকে বঞ্চিত করবেন মিস্ রায়?

সুমিতা চুপ করে রইল। তারপর চোখ মুছে বলল, আমাকে কয়েকটা দিন ভাববার সময় দিন। আমি মনস্থির করতে পারছি না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সর্বেশ্বর বলল, বেশ, তাই হবে। তবে আমার একটি অনুরোধ আপনাকে। দয়া করে আমার অযোগ্যতা ছাড়া আর কোন বাধার কথা ভাববেন না।

কি বুঝল সেই জানে। সুমিতা শুধু ঘাড় কাত করল।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে সর্বেশ্বরের পিছন পিছন নামতে নামতে আপন মনেই বলল, যোগ্যতার বিচার তুললে আমিই যে হেরে যাব। সে হার আমি মানব না—মানব না।

॥ ৯ ॥

কয়েকদিন পরে।

সেরেস্তায় ফরাসে বসে জমিদারীসংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছিল সর্বেশ্বর। সুন্দরবন এলাকার জমিদারীর দরুণ সরকারী ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে কি একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে সেই সম্পর্কেই আলোচনা করছিল সরকারমশাইয়ের সঙ্গে।

এমন সময় দরোয়ান এসে ডাক দিয়ে গেল।

কয়েকখানা চিঠি শুধু ঠিকানা পড়েই একপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে একখানা খামের চিঠির ঠিকানায় চোখ পড়তেই হঠাৎ থমকে গেল সর্বেশ্বর। আর একবার ঠিকানার লেখাটা দেখে নিয়ে খামের উল্টো পিঠে লাগানো ডাক-টিকিটের উপর ডাকঘরের ছাপটা একটু লক্ষ্য করে দেখল। তারপর খামখানাকে আলাদা করে সরিয়ে রেখে অন্য চিঠিপত্রগুলো দেখতে লাগল। চিঠি দেখা শেষ হলে কয়েকখানা এগিয়ে দিল সরকারমশাইকে। সেগুলো জমিদারীসংক্রান্ত। অন্য চিঠিগুলো টেবিলের টানায় রেখে খামের চিঠিখানা নিয়ে উপরে উঠে গেল সর্বেশ্বর।

চিঠিখানা দেখে ভারী বিস্মিত হয়েছে সর্বেশ্বর।

কণিকার চিঠি। তার নিজের হাতে ঠিকানা লেখা। কিন্তু এ কি করে সম্ভব হল?

মিঃ সোমের বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে সেদিন রাতে বেরিয়ে আসবার ঘটনাটা তার মনে পড়ল। কণিকার প্রতি তার রাগ ও ব্যঙ্গের মাত্রাটা সেদিন সীমা ছাড়িয়েই গিয়েছিল। সর্বেশ্বর পরে ভেবে

দেখেছে, ঘটনাচক্রে তার সম্পর্কে সোম-পরিবারের মনোবৃত্তি যাই হোক না কেন, কণিকার সঙ্গে দীর্ঘদিনের আলাপ-পরিচয়ে তার যে হৃদয়-সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে, তাতে সেদিন রাতে অতটা রুষ্ট হওয়া তার বুঝি উচিত হয়নি। বুঝিবা কিছুটা অশোভনও হয়েছে। হয়তো অহেতুকও।

কিন্তু—এবং সেইখানেই সর্বেশ্বরের বিস্ময়—অহেতুকই হোক আর হেতুকই হোক, সে রাতে যে ব্যবহার সে করে এসেছে, যে রকম নাটকীয় ভঙ্গীতে জানিয়ে এসেছে বিদায়-সম্ভাষণ, তারপরেও কণিকার মত মক্ষীরাণী-মেয়ে যেচে তার কাছে চিঠি লিখল কেমন করে ?

পরম কৌতূহলে খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়ল সর্বেশ্বর।

সত্যি, কণিকার চিঠি। এবং চিঠির বক্তব্য অধিকতর বিস্ময়কর। বুঝিবা সর্বেশ্বরের পক্ষে বিরক্তিকরও। কিছুটা বা আশংকারও কারণ।

আধুনিকতম কলকাতার একটা ছোট সংস্করণ সদলবলে আসছে রাজবাড়িতে। কয়েকদিনের প্রমোদ-ভ্রমণে। স্ত্রী-পুরুষ মিলে সাত আটজনের নামের একটা তালিকাও চিঠিতে আছে। অবশ্য মিস্ কণিকা সোমের নাম সে তালিকায় নেই। যদিও চিঠির লেখিকা সে নিজে, তবু তার আসা বা না-আসার কোন ইঙ্গিত চিঠিতে নেই।

সর্বেশ্বরের মনে পড়ল, মিঃ সোমের বালিগঞ্জের বাড়ির ড্রয়িং রুমে বসে কফির ঝলক আর সিগ্রেটের ধোঁয়ার ফাঁকে ফাঁকে সর্বেশ্বরের 'রাজবাড়ি'তে একটা আউটিং-এর প্রস্তাব অনেকদিন থেকেই মুখে মুখে ঘোরাফেরা করছিল। সর্বেশ্বর খুব উৎসাহী না হলেও সে প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। বরং বলা চলে রাজীই হয়েছিল। শুধু দিনক্ষণটা ঠিক করা বাকি ছিল।

তারপর হঠাৎ সেদিন রাতে তপন-কণিকাকে কেন্দ্র করে একটা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হল। সর্বেশ্বরও ঝোঁকের মাথায়

পরিস্থিতিকে উগ্রতর করে সেখান থেকে চলে এল। কলকাতার বাড়িতে ফিরেই পেল পিসিমার চিঠি। পেল সুমিতার সংবাদ। পরদিনই টেলিগ্রাম করে দিল রাজবাড়িতে—সে যাচ্ছে।

কি ছিল বিধাতার মনে। মিঃ সোমের ড্রয়িংরুমে নিয়মিত যাতায়াত করেও যে মন ছিল মোহমুক্ত, সেই মনের চোখেই বুঝি মোহাঞ্জন লাগল সুমিতার দরদী মনের কাজলে। সে অঞ্জন-রেখা মধুরতর হল সুমিতার সেবায় ও সহানুভূতিতে। সর্বেশ্বরের যে মন ছিল ঘরছাড়া বিবাগী, সুমিতার অল্পদিনের সাহচর্যেই সে মনে নতুন করে জাগল ঘর বাঁধবার আশা।

সেই আশায়ই মশগুল হয়ে রাজবাড়ির কক্ষ হতে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সর্বেশ্বরের মন। সুমিতার মনের কাছাকাছি যাওয়াই হয়ে উঠল তার একমাত্র স্বপ্ন। মন হতে মুছে গেল আর সব কিছু। মুছে গেল বালিগঞ্জ, ড্রয়িংরুম ও কণিকা সোম।

স্বভাবতঃই সেই সঙ্গে তার মন থেকে মুছে গিয়েছিল খেয়াল-খুশির সেই আউটিংএর প্রস্তাব। এমন কি এখানে আসবার পরে সেখানে একখানা চিঠি দেবার কথাও তার মনে আসেনি এতদিনের মধ্যে।

তাইতো কণিকার চিঠি পেয়ে বিস্মিত হয়েছে সর্বেশ্বর। ততোধিক বিস্মিত হয়েছে চিঠির বক্তব্য জেনে।

একটু আতংকিতও হয়েছে।

তার ভুবনে এখন সুমিতাই একমাত্র কেন্দ্র। না জানি এতগুলি নতুন নক্ষত্রের আবির্ভাবে কি অঘটন ঘটে বসবে তার জীবনের সৌর-জগতে! সুমিতার দোলাচল চিত্তে না জানি কি প্রতিক্রিয়া ঘটাবে এই নবাগতা মনোরঞ্জনীর দল!

তবু—সর্বেশ্বর নিজের মনেই ভেবে একটু স্বস্তি পায়—ভরসা যে এ দলের সঙ্গে কণিকা আসছে না। না না, সে আসবে না, আসতে পারে না। সর্বেশ্বরের মন যেন জোর দিয়েই বলে ওঠে কথাগুলো।

কণিকার চিঠিখানা আর একবার পড়ল সর্বেশ্বর। সে লিখেছে :

এই চিঠি পেয়ে তুমি বিস্মিত হবে। হয়তো আমাকে একটু শেমলেস্ ভেবে আত্মপ্রসাদও অনুভব করবে। তবু সেদিন যা ঘটেছে সেটা একান্তভাবেই আমার ব্যক্তিগত কথা। সে কথাকে নিয়ে অন্যদের মধ্যে অনেক কথা লোফালুফি হবে সেটা আমি চাই না। তাই ওদের সকলের অনুরোধেই এই চিঠি লিখছি। এবং এই প্রস্তাব করছি। সবাই ঠিক করেছে, আগামী......

চিঠি শেষ করে নিজের মনেই ঘাড় নাড়ল সর্বেশ্বর। বার বার যেন বলতে লাগল, না না, সে আসবে না, আসতে পারে না।

চিঠিখানা হাতে করে গেল পিসিমার কাছে। চিঠিটা তার হাতে দিয়ে বলল, এখন কি করি বল তো পিসিমা?

চিঠিতে চোখ বুলিয়ে পিসিমা বললেন, কি আবার করবি? ওদের এখানে যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা কর্।

—না, মানে আমি ভাবছিলাম কি, হুড়মুড় করে ওরা সব এসে পড়লে এদিকে আবার কিছু অসুবিধা না হয়—

সর্বেশ্বরের মনের আসল 'কিন্তু'টা যে কোথায় পিসিমা তা জানেন। তাই মৃদু হেসে তিনি বললেন; কিন্তু অন্য কোন ব্যবস্থার পথ তো ওরা রাখেনি। ওরা যে নিজেরাই দিনক্ষণ সব ঠিক করে চিঠি দিয়েছে। এখন তো আর ওদের না বলা যায় না। কি বলিস?

সর্বেশ্বর অন্যমনস্কভাবে বলল, তা তো বটেই।

পিসিমা আবার কথা বললেন, শহরের সব বড় ঘরের মানুষ ওরা। এখানে এলে অসুবিধা হয়তো ওদের হবে। তা সেজন্য তুই ভাবিস না। তুই বরং সরকারমশাইকে আজই কলকাতা পাঠিয়ে দে। ভাল খাবার-দাবার কিছু নিয়ে তিনি যেন কাল ভোরেই ফিরে আসেন।

—আচ্ছা, তাই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কথা কয়টি বলতে বলতেই সর্বেশ্বর একতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

পরদিন বিকেলে।

রাজবাড়ির মোটর এসে থামল সিং-দরজার সামনে। ওদের জিনিসপত্র ও সঙ্গের লোকটিকে নিয়ে সরকারমশাই ও দরোয়ান আসছে পিছনে ঘোড়ার গাড়িতে।

মোটর থেকে প্রথম নামল কণিকার দিদি মিসেস মণিকা চৌধুরী। হঠাৎ একটা জরুরী দরকারে সে কলকাতা ফিরে এসেছে। অতএব আউটিং-এর দল তাকে কিছুতেই রেহাই দেয় নি।

মিসেস মণিকার মাথায় সিল্কের গাঢ় সবুজ রঙের বড় রুমালটা বনেটের মত করে বাঁধা। চোখে কালো গগল্‌স্‌।

চারদিকে একবার চেয়েই সে একেবারে উচ্ছসিত হয়ে উঠল, ওঃ, হাউ লাভলি। জানেন মিঃ পুরোকায়স্থ, এই মুহূর্তে আমার যেন মনে হচ্ছে, স্কটল্যাণ্ডের একটা মিডিয়াভ্যাল ক্যাসলের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে, এখুনি কোন মহামান্য ব্যারণ কোমরে সোর্ড ঝুলিয়ে আমাদের সামনে এসে 'স্রাগ' করে দাঁড়াবেন, আর—

মিসেস মনিকার কথা আর শেষ হল না। সিং-দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সর্বেশ্বর। পিছনে গদাধর।

সর্বেশ্বর হাত জোড় করে বলে উঠল, আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য আমার—

মোটর থেকে নামতে নামতেই ফোঁস করে উঠল মিসেস সিংহ, সৌভাগ্য না হাতি। তবু যদি আমাদের নেমন্তন্ন করতেন একবার। আপনি তো বেমালুম সব ভুলেই গেছলেন। আমরা নেহাৎ নাছোড়বান্দা তাই—

—সত্যি মিসেস সিংহ, আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। মানে, এদিকে নানা রকম সাংসারিক ঝামেলায় এমন জড়িয়ে পড়েছি—

কথা বলল মিসেস মণিকা, আমাদের বাঙালীদের এই এক মস্ত দোষ। অল্‌মোস্ট ইনকরিজিবল্। সংসার আর সমাজকে নিয়েই আমরা ব্যস্ত। আমরা একেবারেই ভুলে যাই যে ইণ্ডিভিডুয়েলকে নিয়েই সমাজ। তাই সেই ইণ্ডিভিডুয়েলের গ্রোথ, মানে তার বিকাশ যাতে হয়—

বাধা দিল তপন, দেখুন মিসেস চৌধুরী, আপনার এই সুন্দর কথাগুলো রাতের ভোজের টেবিলেই কি বেশি মানাত না? এখানে এই ফাঁকা মাঠে, বিশেষ করে এই শূন্য উদরে—

হি হি করে মিষ্টি হাসি হেসে উঠল মিসেস কণিকা, দেয়ার ইউ আর। তপন ইজ ভে-রি ক্লেভার ইন হিজ স্টেটমেণ্ট। বুঝতে পেরেছ তো সর্ব, ওর কথার আসল ইম্‌পোর্ট-টা কোথায়?

মৃদু হেসে সর্বেশ্বর বলল, আপনারা যখন অনুগ্রহ করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন তখন এই গরীবখানায় খুঁদ-কুড়ো যা জোটে—

হাসতে হাসতে বাধা দিল মিঃ সিংহ, গরীবখানা কি বলছেন মশায়? ক্যাসল বলুন।

সর্বেশ্বর ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে মিঃ সিংহের মুখের দিকে তাকাল।

মিঃ সিংহ বলল, মিসেস চৌধুরী যে এখনো স্কটল্যাণ্ডেই আছেন। ওর চোখে তাই আপনাদের রাজবাড়ি মধ্যযুগের ক্যাসল্ হয়ে প্রাণ-প্রাচুর্যে ঝল্‌মল্ করছে।

কথাটায় সর্বেশ্বরের মনে একটু আঘাত লাগল। বাড়িটা বড়। দুর্গেরই মত। কিন্তু প্রাচীন। জীর্ণ। চোখ তুলে একবার বাড়ির এক কোণে ছাদের উপর দাঁড়ানো বট গাছটার দিকে তাকাল সে। তারপর বলল, তা এ বাড়িকে এখন রাজবাড়ি না বলে ক্যাসল্ বলাই

বোধ হয় সঙ্গত। রাজবাড়ির রাজত্ব তো গেছে সরকারের কলমের খোঁচায় উড়ে। শুধু বর্গীর হাঙ্গামার স্মৃতি বুকে নিয়ে বাড়িটাই এখনো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আর কথা নয়। ভিতরে চলুন সবাই অনুগ্রহ করে। গেলেই বুঝতে পারবেন, এখানে এখনো মধ্যযুগই বাসা বেঁধে আছে। তবে তার প্রাণও নেই প্রাচুর্যও নেই। আসুন মিসেস চৌধুরী।

মুখ ঘুরিয়ে সর্বেশ্বর ভিতরের দিকে পা বাড়াল। কেমন যেন চুপ-চাপ সবাই তার পিছু পিছু রাজবাড়ির সিং-দরজা পার হল।

সিং-দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে যদি কেউ সে সময় দোতলার জানালায় দৃষ্টি ফেলত তাহলে তার চোখে পড়ত, আত্মসংবরণের প্রাণ-পন চেষ্টায় বিব্রত একটি নারীমূর্তি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিচের দিকে চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

আধুনিক বালিগঞ্জ বা নিউ আলিপুরের ছোট এক টুকরো প্লট রকমারী রঙের জৌলুস ছড়িয়ে চটুল ও সস্তা রসিকতার ফুলঝুরি উড়িয়ে প্রাচীন রাজবাড়ির কক্ষ হতে কক্ষান্তরে কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুযায়ী আয়োজিত প্রচুর আহার্যের কিছু খেয়ে আর ততোধিক অপচয় করে, প্রসাধনরঞ্জিত ঠোঁটের ফাঁকে বারে বারে 'হাউ লাভলি' আর 'হাউ চার্মিং'-এর ধ্বনি তুলে একদিন আবার স্বস্থানে প্রস্থান করত। প্রকাণ্ড রাজবাড়িটা আবার নিঝুম হয়ে পড়ত। সময়ের স্রোত দুর্বার গতিতেই বয়ে চলত।

কিন্তু এই সেকেলে বাড়িতে তাদেরি মত আর একটি একেলে মেয়ে যে বিজয়িনীর মত শিরদাঁড়া উঁচু করে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে, যে তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপূর্ব পরিচয়, যার একমাত্র পরিচয় তারা এখানে এসে জেনেছে যে সে এই রাজবাড়ির একমাত্র মালিকের এক-মাত্র কন্যার গৃহ-শিক্ষয়িত্রী, সেই মেয়েটিকে নিয়েই আধুনিক

কলকাতার এই এক টুকরো প্লটের মাথা ব্যথার আর অন্ত রইলো না।

মেয়েটির পরিচয় শুনেই মিস্ তনুশ্রী ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে উঠল, গৃহ-শিক্ষয়িত্রী। তার মানে মিষ্ট্রেস। এখন পদবীটা মেয়ের থেকে বাপ পর্যন্ত প্রমোশন না পেয়ে বসে।

এ কথায় সবারই ঠোঁটে কয়েক টুকরো কাষ্ঠহাসি ছড়িয়ে পড়ল।

মিসেস্ মনিকা নিচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে বলল, এখন বুঝতে পারছি, কেন কণি আমাদের সঙ্গে কিছুতেই এল না। কেন একটা বাজে অজুহাত দেখিয়ে আমাদের দল থেকে কেটে পড়ল। নিশ্চয়ই এ ধরণের কোন ইনফরমেশন সে পেয়েছিল।

কথার রেশ টানল তপন, আহা, আমরাও তো ভেবেই পাইনি, মিঃ রায় হঠাৎ এমন বেপাত্তা হয়ে গেলেন কেন? ও বাবা! মিস্টার যে এখানে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন, তা কি করে গেস্ করব বলুন?

দলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যাচিলর এটর্নি মিঃ সমাদ্দার ফোড়ন কাটল, আরে বাবা, সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার, একাদশীস্ ফাদার নট নোয়িং এনিথিং।

এমনি নানা ধরণের পরচর্চার সুড়সুড়ি আর ফিসফিসানি চলল সারাটা সন্ধ্যা। শুধু নিজেদের মধ্যেই নয়, সুযোগ মত সুমিতাকে লক্ষ্য করে শব্দভেদী বান ছুঁড়তেও তারা কসুর করল না।

সামান্য পরিচয়েই এদের মনের চেহারাটা আঁচ করে নিতে সুমিতার দেরি হয় নি। তাই নিজের মনের দ্বন্দ্বকে মনের মধ্যেই চেপে রেখে সে সযত্নে এদের সঙ্গ পরিহার করেই চলেছে। শুধু এই বাড়ির একজন অধিবাসী হিসেবে অতিথিদের সঙ্গে যতটুকু মেলামেশা অবশ্য কর্তব্য তার বাইরে একটি পাও সে অগ্রসর হয় নি।

তবু সংঘর্ষকে এড়ান গেল না। পরদিন সকালেই অবস্থাটা চরমে উঠল।

সকালের চায়ের আসরে সুমিতা ইচ্ছা করেই গেল না। ইন্দ্রাণীকে নিয়ে পড়ার ঘরেই কাটিয়ে দিল।

তার এই অনুপস্থিতি কিন্তু অতিথিদের দৃষ্টি এড়াল না। নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে একটু ফিসফিস করে একজন প্রকাশ্যেই বলে ফেলল, মিস্ রায়কে তো দেখছি না চায়ের টেবিলে ?

সবারই চোখে সেই একই জিজ্ঞাসা একটুকরো বাঁকা হাসির সঙ্গে ঝিলিক্ দিয়ে উঠল।

জবাব দিলেন পিসিমা, সুমিতার শরীরটা আজ ভাল নেই। তাই আসে নি এখানে।

একজন বলল, তাই বুঝি ? তাহলে তো আমাদেরই একবার নক্ করতে হয় তার দরজায়।

পিসিমা বললেন, কিন্তু সে তো তার নিজের ঘরে নেই। রাণীকে নিয়ে পড়াতে বসেছে।

তপন অদ্ভুত গম্ভীর স্বরে বলল, ওঃ!

আর কেউ কিছু বলল না।

সর্বেশ্বর সারাক্ষণ চুপ করেই ছিল। তেমনি নীরবেই চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল।

চায়ের পর্ব শেষ করে ওরা জনকয়েক ঘুরতে ঘুরতে যেয়ে হাজির হল পড়ার ঘরে।

সুমিতা উঠে দাঁড়িয়ে ওদের অভ্যর্থনা করল, আসুন আসুন।

কথা বলল মিসেস মণিকা, আপনাকে চায়ের টেবিলে পেলাম না। শুনলাম, শরীর ভাল নেই। তাই—

সুমিতা বলল, না না, সে তেমন কিছু নয়। আপনারা বসুন।

তপন বলল, কিন্তু আমাদের বসাটা কি আপনার মনঃপুত হবে মিস্ রায় ?

চকিতে মুখ তুলে সুমিতা বলল, আপনার কথার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—মানে, ছাত্রীর পড়াশুনা নিয়ে আপনি এখন ব্যস্ত আছেন, তাই বলছিলাম।

তপনের বক্তব্য আর তার ভঙ্গীর মধ্যে যে অনেকখানি ফাঁক আছে সেটা বুঝতে সুমিতার কষ্ট হল না। তাই একটু রূঢ় কণ্ঠেই সে বলল, পড়াশুনা তো রোজই আছে। আর পড়াশুনা আছে বলেই অভ্যাগত অতিথিদের প্রতি অশোভন ব্যবহার করব, এতটা অভদ্র আমাকে ভাবলেন কি করে বলুন তো?

রাগের মাথায় কথা কয়টি বলে ফেলেই সুমিতার খেয়াল হল, ইন্দ্রাণীর সামনে এ ধরণের আলোচনা করা সত্যিই তার সঙ্গত হয় নি। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, রাণী, এ বেলার মত তোমার ছুটি। বাকি পড়াটা ও বেলায়ই হবে 'খন।

ইন্দ্রাণী বই-পত্র গোছাতে গোছাতে বলল, আচ্ছা মাসিমণি, আমি বরং দুপুর বেলায়ই অংকগুলো করে রাখব।

সুমিতা টেবিলের উপর থেকে পেন্সিলটা তার হাতে দিয়ে বলল, হ্যাঁ, তাই করো।

মিসেস সিংহ হঠাৎ বলে উঠল, কি বললে খুকু? মাসিমণি?

বলেই সে খুক্ খুক্ করে হেসে উঠল।

মাসিমণি বলাতে হাসির কারণ কি থাকতে পারে বুঝতে না পেরে ইন্দ্রাণী হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু কারণটা অনুমান করতে মুহূর্তমাত্র দেরি হল না সুমিতার। ক্রোধে ও ক্ষোভে তার ভিতরটা জ্বালা করে উঠল। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল শানিত ঝিলিক্।

মিসেস মণিকা ততক্ষণে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে। বাঁকা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সে বলল, মাসিমণি! ফাঁদটা পেতেছেন ভাল মিস্

রায়। তা ওর মাঝখান থেকে 'সি'টা উঠতে আর দেরি কেন? আমরা সবাই তো হাজিরই আছি। মিস্টান্নম্ ইতরে জনাঃ-টা একেবারে হয়ে যাক।

সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল সুমিতার। বলল, রাণী, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও এখান থেকে।

মাথা নিচু করে ইন্দ্রাণী চলে গেল। বেশ বোঝা গেল, ওর চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে।

ইন্দ্রাণীর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই ফণা-তোলা সাপের মত ঘুরে দাঁড়াল সুমিতা। কঠিন গলায় বলল, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এতটুকু শিষ্টাচার জ্ঞান আপনাদের নেই? ওই একফোঁটা মেয়ের সামনে এই সব কথা বলতে আপনাদের ভদ্রতায় একটু আটকাল না?

গ্রীবা বাঁকিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল মিসেস মণিকা। অভ্যস্ত শল্যবিদ যেমন ধীরে ধীরে অস্ত্র চালায় রোগীর দেহে তেমনি টেনে টেনে সে বলল, শিষ্টাচার? ভদ্রতা? দেখুন মিস্ রায়, ভদ্রতায় নিশ্চয়ই আটকাতো যদি আপনার টারগেটটি অন্যের কাছে বাগদত্ত না হত—যদি আর একটা বৃন্দাবন-লীলা না থাকত এই মথুরা-লীলার পিছনে।

উদ্যত ফণার মাথায় যেন লাগল বিষ-পাথর। পায়ের তলা থেকে যেন সরে যেতে লাগল পৃথিবীর মাটি। অসহায় ভগ্নকণ্ঠে বলে উঠল সুমিতা, আপনি—আপনি কি বলছেন মিসেস চৌধুরী?

—ঠিকই বলছি মিস্ রায়। আপনার মিঃ রায় অর্থাৎ এই রাজবাড়ির রাজকুমার আমার ছোট বোন কণিকার সঙ্গে বাগদত্ত। বিয়ের দিনক্ষণটাই শুধু বাকি, নইলে আর সবই পাকা।

—মিথ্যে কথা। কিছুই পাকা হয় নি। আপনার কথার সবটাই কাঁচা।

গম্ভীরকণ্ঠে কথাগুলি বলতে বলতে ঘরে ঢুকল সর্বেশ্বর। তার চোখ-মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে।

রুখে দাঁড়াল মিসেস্ মণিকা, কি বললেন? আমার কথা মিথ্যে? কণির সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা হয় নি?

—বিয়ের কথা একটা হলেই সেটা পাকা হয়ে যায় না। তাছাড়া আপনার বোনের সঙ্গে কথা বললেই জানতে পারতেন, এবারে আসবার সময় সে সম্পর্ক আমি একেবারেই চুকিয়ে দিয়ে এসেছি।

—ওঃ, তাই বলুন। আমার অনুমান তাহলে মিথ্যে নয়। নতুন ফুলের সন্ধান পেয়েই আপনি ছুটে এসেছিলেন এখানে।

রাগতঃ স্বরে বাধা দিল সর্বেশ্বর, আপনি কি বলছেন?

মণিকাও গলার পর্দা চড়িয়ে জবাব দিল, ঠিকই বলছি। এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি কেন কণি কিছুতেই আমাদের সঙ্গে আসতে রাজী হয়নি। সি নিউ হার পজিশন কোয়াইট ওয়েল। কিন্তু এ কথা আপনার আমাদের জানানো উচিত ছিল।

—কি কথা আমি আপনাদের জানাইনি যা জানানো আমার উচিত ছিল?

—জানানো উচিত ছিল যে মেয়ের মিষ্ট্রেস হয়ে যিনি এসেছেন তিনিই হয়ে উঠেছেন নিজের মিসেস।

আর্তনাদ করে উঠল সুমিতা, মিসেস্ চৌধুরী!

কথা বলল সর্বেশ্বর, ওদের কথায় তুমি অতটা উত্তেজিত হয়ো না সুমিতা।

সুমিতা! সর্বেশ্বর এই প্রথম তাকে নাম ধরে ডাকল। সে ডাক কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো। আকুল করিল মন-প্রাণ!

এক অনাস্বাদিত পুলকে দুলে দুলে উঠতে লাগল সুমিতার অন্তর। মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠল গানের কলি—'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ!'

কিন্তু পরমুহূর্তেই বিস্ময় এবং লজ্জা যুগপৎ তার মনকে ঘিরে ধরল। চকিতে সম্বিত ফিরে পেয়ে সুমিতা সলাজ নিম্নকণ্ঠে বলল, কিন্তু মিঃ রায়—

বাধা দিল সর্বেশ্বর, এতো সংকোচ তোমার কিসের সুমিতা? যা সত্য, আজ বাদে কাল যা তোমার-আমার জীবনে সব চেয়ে সত্য হয়ে উঠবে, তাকে প্রকাশ করতে এত কুণ্ঠা কেন তোমার? চোখ তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াও। ওদের প্রশ্নের জবাব দাও।

সলাজ ভীত কণ্ঠে তবু সুমিতা বলল, আমি—মানে—

সর্বেশ্বর বলল, হ্যাঁ, তুমিই তো জবাব দেবে। সহজ গলায় বল যে, কোন কিছু জানাবার সুযোগ দিয়ে তো আপনারা আসেন নি। দিনক্ষণ সব নিজেরাই স্থির করে এসেছেন। তাছাড়া আপনারা এসেছেন বন্ধুত্বের দাবীতে, বৈবাহিক সম্পর্কের সূতো ধরে তো নয়। এখানে মিষ্ট্রেস আছে কি মিসেস আছে, আপনাদের প্রমোদ ভ্রমনের পক্ষে সেটা অবান্তর।

কথার জোয়ার এসেছিল সর্বেশ্বরের গলায়। যে কথাটা বলবার জন্য তার সমস্ত মনটা উদ্‌গ্রীব হয়েছিল, ঘটনাচক্রে সে কথাটা বলতে পারবার মত একটা সুযোগ পেয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে তার মন। সুমিতাকে সে জানাতে পেরেছে তার মনের কথা। তার মর্মের আবেদন। এই আনন্দেই উচ্ছল ঝর্ণার মত বয়ে চলেছে তার বাণীর স্রোত।

কিন্তু মাঝপথে উপলাহত হল সে স্রোত। হঠাৎ সুমিতা বলে উঠল, আমি যাই।

বলেই কারো কোন কথার জন্য অপেক্ষা না করে কারো মুখের দিকে না তাকিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সর্বেশ্বর স্তব্ধ বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তার গমন পথের দিকে।

তবে কি উপেক্ষিত হল তার মর্মের আবেদন ? সুমিতা কি তাকে অস্বীকার করে চলে গেল ? এতদিন তাহলে সে কী দেখল ? কী শুনল ? সুমিতার প্রতিটি চলায়, প্রতিটি বলায় যে প্রতিশ্রুতির সুধা-রসে ভরে উঠেছিল তার মর্ম-কোষ, সে কি মরীচিকা ? সে কি মিথ্যা ?

দিশেহারা হয়ে পড়ল সর্বেশ্বর।

তার অসহায় ভাবকে নিয়ে খেলা করবার লোভ সামলাতে পারল না মিসেস মণিকা। বিদ্রুপের সুরে বলে উঠল, এখানে দাঁড়িয়ে ভাবলে কি হবে মিঃ রায় ? শিগগির যান, শ্রীমতীর মান ভাঙিয়ে আসুন। আর একবার বৃন্দাবন-লীলার অভিনয় দেখে আমরা নয়ন সার্থক করি। দুই হাঁটু ভেঙে করজোড়ে বলুন গে, দেহি পদপল্লবম্। হ্যাট উড বি এ সাইট ফর দ্য গডস্ টু সি।

আবার খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল মিসেস মণিকা। দলের সবার কণ্ঠে জলতরঙ্গ বেজে উঠল।

অসহায় আক্রোশে দাঁতে দাঁত চেপে সর্বেশ্বর সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

অনেক কণ্ঠের চপল হাস্যধ্বনি যেন শানিত চাবুকের মত তার পিঠে এসে আঘাত করতে লাগল।

উদ্‌ভ্রান্তের মত টানা বারান্দা ধরে এগিয়ে চলল সর্বেশ্বর।

সুমিতার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। মুহূর্তমাত্র কি যেন ভাবল। তারপর দরজায় টোকা দেবার জন্য হাত লাগাতেই পাল্লাটা নিঃশব্দে খুলে গেল।

নিজের বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে সুমিতা। কান্নার আবেগে তার সারা শরীরটা দুলছে।

হতবাক হয়ে দরজার উপর দাঁড়িয়ে রইল সর্বেশ্বর। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সে। কি করবে এখন ? ফিরে যাবে ? কিন্তু

কোথায় যাবে? অনিশ্চয়তার অন্ধকারে? শানিত বিদ্রূপের সেই অট্টহাসির দেশে?

না না, মরিয়া হয়ে উঠল সর্বেশ্বর, যে পথে একবার পা দিয়েছে তার শেষ না দেখে সে ফিরবে না।

যদি পথের শেষে তার ভাগ্যে লেখা থাকে অতলস্পর্শ অন্ধকার খাদ, তবে আবার ফিরে যাবে জনতার অরণ্যে। কিন্তু শেষ সে দেখবেই।

নিশঃব্দ পদসঞ্চারে আরো একটু এগিয়ে নরম গলায় ডাকল, সুমিতা!

—কে?

চম্‌কে বিছানার উপর উঠে বসল সুমিতা। সর্বেশ্বরকে দেখেই মুখ নিচু করে নিল। ত্রস্ত হাতে মুছে ফেলল চোখের জল। বিস্রস্ত বেশবাশ ঠিক করে নিতে নিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি!

সর্বেশ্বর মনের সমস্ত শক্তি এক করে বলল, আমার ব্যবহারে যদি আপনি আঘাত পেয়ে থাকেন, যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি, তাহলে আপনি ক্ষমা করবেন মিস্ রায়। শুধু এইটুকুই জেনে রাখুন যে, ঘটনাচক্রে হলেও মনের সত্য কথাটাই আমি বলেছি, লোক-দেখানো কথা নয়।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না সুমিতা। ভেঙে গেল সংযমের বাঁধ। আবেগে কাঁপা গলায় সে বলল, আমি জানি—আমি জানি।

—তাহলে বলুন, আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন?

আবেগে ভেঙে পড়ল সুমিতা, ওগো, না না, ক্ষমার কথা বলে আর আমাকে অপরাধী করো না।

নতুন করে বুঝি স্বর্গলাভ হল সর্বেশ্বরের। প্যারাডাইস রিগেইণ্ড! সানন্দকণ্ঠে বলে উঠল সে, তাহলে—তাহলে আমি যা দেখেছি, যা

শুনেছি, যা বলেছি, সব—সবই ঠিক? তুমি আমার কথায় রাগ করো নি?

সুমিতা মুখ তুলে মৃদু হাসল। কোন কথা বলল না।

সর্বেশ্বর বলল, তাহলে ওদের সামনে থেকে অমন করে পালিয়ে এলে কেন তুমি?

মিলিয়ে গেল সুমিতার মুখের হাসি। ভীতা হরিণার মত বলল, এত বড় সৌভাগ্যকে আমি যে সইতে পারি নি। আমি যে তোমার অযোগ্য।

কৃত্রিম ক্রোধে ফেটে পড়ল সর্বেশ্বর? কিসে? কিসে তুমি অযোগ্য?

—আমি—আমি যে দরিদ্র।

- কাঞ্চণ কৌলিন্যেই মানুষের পরিচয় নয় সুমিতা।

—কিন্তু সমাজ সংসার তো তাই বলে।

—সে ওই মিসেস মণিকাদের সমাজ। সর্বেশ্বরের নয়। আমাকে কি তুমি এত ছোট ভাব সুমিতা?

তুই হাত নেড়ে সমস্ত দেহ সমস্ত মন দিয়ে 'না না' করে আকুতি-ভরা গলায় সুমিতা বলল, ওগো না না, তোমাকে আমি ছোট ভাবি না। তোমাকে ছোট ভাবা আমার পাপ। তুমি যে দেবতার চেয়েও বড়।

বলতে বলতে সুমিতার গলা ধরে গেল। চোখের কোলে ঝলমল করে উঠল অশ্রুর বিন্দু। গলায় আঁচল জড়িয়ে সর্বেশ্বরের পায়ের উপরে সে উপুড় হয়ে পড়ল।

সর্বেশ্বর কম্পিত হাতে তাকে তুলে ধরল।

তুজনে দাঁড়াল মুখোমুখি।

মরুতীর হতে এসে তুটি প্রাণ-বিহংগ বুঝি দাঁড়াল সুধাশ্যামলিম পারে।

॥ ১০ ॥

বালিগঞ্জের এক টুকরো প্লট সেই দিন বিকেলেই কলকাতা রওনা হয়ে গেল।

সর্বেশ্বরের মনে তখন খুশির হাওয়া। জোড় হাত করে সে তাদের অনুরোধ করল, আর অন্তত একটা দিন থেকে যেতে। পিসিমাও অনেক করে বললেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মিসেস্ মণিকার জিদের গাড়িতে কেউ ব্রেক কশতে পারল না।

রাজবাড়ির সদর দরজায় ওদের মোটরে তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে দোতলায় উঠে গেল সর্বেশ্বর।

সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল সুমিতা। বলল, বন্ধুরা চলে গেল কোথায় মন খারাপ হবে তা নয় তুমি হাসছ?

সর্বেশ্বর দার্শনিক ভঙ্গীতে বলল, দেখ সুমিতা, ইংরেজিতে একটা কথা আছে তুমি নিশ্চয়ই জান—ইভিল ইজ গুড ইন দি মেকিং।

—তা জানি।

—আমি আর একবার নতুন করে জানলাম।

—যথা?

—মিসেস মণিকা চৌধুরীদের দেখে তুমি তো ভয়েই অস্থির। যেন মূর্তিমান ইভিল। অথচ ওরা এসেছিল বলেই তো আজ সুমিতা বলে ডাকতে পারলাম।

—মানে?

—মানে উনি তোমাকে ওভাবে চার্জ না করলে কি আর মনের কথাটা এত সহজে মুখে আনতে পারতাম?

হেসে উঠল সুমিতা, ওঃ, এই কথা। এরই জন্যে এত বড় ভূমিকা! আমি আরো ভাবলাম না জানি কি বড় কথা।

—সে কি সুমিতা, বড় কথা নয়? এর চেয়ে বড় কথা আর আছে না কি আজ? আকাশে বাতাসে আজ—

বাধা দিল সুমিতা, আঃ, কি ছেলেমানুষি করছ? আমি যাই—

খপ করে সুমিতার হাতটা ধরে সর্বেশ্বর বলল, যাবে তো বটেই। তবে আমিও সঙ্গী হব তব।

—মানে?

—মানে বেলা পড়ে এসেছে। চল ছাদে যাই। যাবে?

—চল।

ছাদে এসে দাঁড়াল দুজন হাতে হাত ধরে।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য পাটে বসছে ধীরে ধীরে। আকাশে এখনো রঙের ছোপ লাগে নি। তবে ম্লান হয়ে এসেছে সূর্যের তেজ।

নীরবে হাঁটতে হাঁটতে ছাদের একেবারে এক কোণে যেয়ে দাঁড়াল ওরা।

ওদের পাশেই সেই অশথ গাছটা। কার্ণিশের বুক চিঁরে আকাশে মেলে দিয়েছে সবুজের হাতছানি।

গাছটার দিকে আঙুল বারিয়ে সর্বেশ্বর বলল, জানো সুমিতা, প্রায় রাতেই এই বটগাছের ডালে বসে একটা পেঁচা ডাকে।

সুমিতা বলল, জানি।

—কি করে জানলে?

—আমিও শুনেছি সে ডাক।

সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভয়ংকর রাতের কথা সুমিতার মনে পড়ে গেল। পেঁচার কর্কশ ডাকে ঘুম ভেঙে ও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। এমন

সময় সর্বেশ্বর এসে ওকে ডেকে নিয়ে গেল হলঘরে। সেখানে সর্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় অবস্থায় বিছানায় পড়ে ছিল রমানাথবাবু······

সেই ভয়ংকর দৃশ্যের কথা মনে হতেই দিনের আলোতেও সুমিতার বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল। সর্বেশ্বরের হাতটা আরো জোরে চেপে ধরে সে বলল, আমার একটা কথা তুমি রাখবে ?

—কি কথা বল ?

—বল রাখবে ?

—কেন রাখব না ? তুমি বল।

—এ বাড়িতে আমরা আর থাকব না। চল অন্য কোথাও চলে যাই।

সুমিতার দিকে খানিক চেয়ে থেকে সর্বেশ্বর বলল, তুমি যখন বলছ, না হয় যাব। কিন্তু কেন বল তো ?

—দেখ, সেই ভৌতিক ছায়ামূর্তির কথা মনে হলে আমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল সর্বেশ্বর। কোন কথাই বলল না।

সুমিতা তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, কি হল ? কথা বলছ না যে ? বল যাবে ?

ধীরে ধীরে কথা বলল সর্বেশ্বর, ওই ছায়ামূর্তিকে আমারও বড় ভয় সুমিতা। এতদিন ওকে আমি ভয় করি নি। কিন্তু এবার ও আমার কাছেও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

শিউরে উঠল সুমিতা, সে কি ? সে ছায়ামূর্তি কি তুমি আরো দেখেছ নাকি ?

—না না, তা দেখি নি। তবু কি জানি কেন বড় ভয় করছে।

সুমিতা বলল, দেখ, এই ভূতে-পাওয়া 'হণ্টেড' বাড়িতে থাকা সত্যি ঠিক নয়। কে জানে কখন কি বিপদ ঘটে বসবে। চল আমরা এ বাড়ি থেকে চলে যাই।

—তাই যাব সুমিতা। কিন্তু বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত তো আর যাওয়া হবে না।

বিয়ের কথা শুনেই কি যেন হঠাৎ মনে হল সুমিতার। সর্বেশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে বলল, তোমাকে আর একটা কথা বলতে চাই।

—বল।

—আমাদের বিয়েটা এখানে হবে না।

—কোথায় হবে তাহলে ?

—কলকাতায়।

—কেন বল তো ?

—আমাদের দুজনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এ বয়সে আর লাল চেলি পরে ছাদনা তলায় দাঁড়াতে পারব না। বড্ড লজ্জা করবে।

—কিন্তু বিয়ে করতে হলে তো ছাদনা তলায় দাঁড়াতেই হবে।

ফিক্ করে হেসে ফেলল সুমিতা। বলল, আচ্ছা, তুমি পারবে কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে গরদের জোড় পরে বিয়ের পিড়িতে দাঁড়াতে ? লজ্জা করবে না ?

—তা তো করবেই। কিন্তু তাছাড়া উপায় কি ?

—উপায় আছে।

—কি ?

—রেজিষ্ট্রী অফিস। দেখ, আজ সারা দুপুর আমি ভেবেছি। বিয়েটা আমাদের রেজিষ্ট্রী করেই হবে।

একখানা কালো মেঘে যেন ঢেকে গেল সর্বেশ্বরের মুখ। ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে বলল, তার মানে আমার উপর তুমি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারছ না ?

প্রশ্ন শুনে আহত হল সুমিতা। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। ঈশ্বর করুন তোমার চেয়ে বেশি নির্ভর আর কারো উপর আমাকে কোন দিন যেন করতে না হয়। তুমি

বিশ্বাস কর মনের মধ্যে এতটুকু ফাঁক থাকলে এ কথা এমন সহজ ভাবে তোমাকে বলতে পারতাম না।

সর্বেশ্বরের মনের সংশয় তবু কাটল না। সে বলল, তাহলে কেন তুমি আমাদের মিলনের মাঝখানে আইনের ফাঁক রাখতে চাইছ?

—দেখ, তুমি যদি একান্তই চাও তাহলে হিন্দু বিবাহের আচার-আচরণ অনুসারেই আমাদের বিয়ে হবে। আমি অমত করব না। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখ যে সেটা একান্তই দরকার কি না। ফাঁকের কথা বলছ? আচ্ছা, তুমি কি মনে কর যে বাইরের কোন বন্ধন দিয়ে মানুষের মনকে বাঁধা যায়? তা সে বিয়ের মন্ত্রই হোক আর আইনের স্বাক্ষরই হোক।

—না, তা মনে করি না। মনের মিল না হলে সবই মিথ্যে।

—তাহলে? সেই মিথ্যেকে আকড়ে ধরব আমরা কিসের প্রয়োজনে? তাছাড়া, আমাদের রাণীর কথাটাও ভেবে দেখ। তার সামনে পারবে তুমি আমার আঁচলের সঙ্গে চাদরের খুট বেঁধে সপ্তপদী গমন করতে? লজ্জায় মাথা হেঁট হবে না?

এবার হেসে ফেলল সর্বেশ্বর। বলল, হার মানলাম তোমার যুক্তির কাছে। কিন্তু পিসিমাকে মানাবে কোন্ যুক্তিতে?

সুমিতা হেসে বলল, সে ভার আমার। শুধু তুমি সহায় থেকো।

—কিন্তু আমার যে দরকার তোমার সহায়তা।

—কেন? আবার কি করতে হবে?

—আমার কয়েকটি কথা তোমাকে শুনতে হবে।

—কথা? তা কয়েকটি কেন, কয়েক শো শুনব। তুমি বল।

—হাসির কথা নয় সুমিতা। বড় গুরুতর কথা। মন ঠিক রেখে শোন। তারপর মাথা ঠিক রেখে জবাব দিও।

সর্বেশ্বরের কথার ধরনে চমকে তার দিকে চাইল সুমিতা।

এ কি?

থম্থম্ করছে তার সারা মুখ। শ্রাবনের আকাশ যেন ছায়া ফেলেছে দুটি চোখে। অস্তসূর্যের আলোয় কেমন রক্তাভ দেখাচ্ছে তার সারা দেহ।

ভয়ার্তকণ্ঠে সুমিতা বলে উঠল, কি হলো তোমার? হঠাৎ এমন ভাবে কথা বলছ কেন? কি বলতে চাও তুমি?

—শুনলেই বুঝতে পারবে।

একটু থেমে সর্বেশ্বর আবার বলল, রমানাথকে তোমার মনে আছে?

রমানাথের কথা মনে হতেই আতংকে শিউরে উঠল সুমিতা। বলল, আছে।

—সেদিন রাতে তার সম্বন্ধে সব কথা তুমি জানতে চেয়েছিলে। সেদিন বাধা ছিল। তাই বলা হয়নি। সে বাধা আজ দূর হয়েছে। সে কথা একমাত্র যাকে আমি বলতে পারি আজ তুমি সেই অনন্যা। তাই সব কথা আজ তোমাকে বলতে চাই।

বলতে বলতে সর্বেশ্বরের কণ্ঠে ফুটে উঠল একটা ক্ষুধার্ত আবেগ। একটা হিংস্র জিঘাংসার ধারালো নখর যেন ছিন্ন ভিন্ন করতে চাইছে সুমিতার হৃদপিণ্ড।

এ কোন্ সর্বনাশা কাহিনীর ভূমিকা করছে সর্বেশ্বর? ভয়ে সংশয়ে চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল সুমিতা, তুমি থামো, তুমি থামো। সে রাতের কোন কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি আমাকে বলো না।

দৃঢ়কণ্ঠে সর্বেশ্বর বলল, কিন্তু সে কথা তোমার জানা দরকার।

—না না, আমি যা জেনেছি তাই যথেষ্ট! এর বেশি কিছু আমি জানতে চাই না।

—ভেবে দেখ সুমিতা, যে কথা আজ তুমি শুনতে চাইছ না, একদিন না একদিন সে কথা তোমার কাণে উঠবেই। সেদিন কিন্তু

তোমাকে অনুশোচনা করতে হবে আজ সেকথা শুনতে চাইলে না বলে।

—ওগো না না, তুমি আমাকে ভয় দেখিও না। আমি জানি, তোমার কাছ থেকে অনুশোচনা করবার মত কিছু আমি কোন দিন পাব না।

—তুমি তাহলে শুনবে না আমার কথা ?

—না না, শুনব না। সে রাতের সব কথা শুনলে হয়তো আর একটা রাতও এ বাড়িতে আমি বেঁচে থাকব না। দোহাই তোমার, তুমি আমাকে বাঁচতে দাও।

যেন কোন হিংস্র প্রাণী তাকে তাড়া করেছে এমনি ভাবে ভীত ত্রস্ত হয়ে সুমিতা সর্বেশ্বরকে জড়িয়ে ধরে হাঁপাতে লাগল।

সর্বেশ্বর তাকে আশ্বস্ত করে বলল, বেশ তো, শুনতে না চাও তো শুনো না। কিন্তু শুনলেই বোধ হয়—

—ও কি ?

আর্তস্বরে প্রশ্ন করল সুমিতা।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন অলক্ষিত পায়ে ছেয়ে এসেছে চারদিক থেকে।

অশথ গাছের ডালে একটা ঝট্‌পট্‌ শব্দ শুনে সে দিকে ফিরে তাকাল সর্বেশ্বর। বলল, ভয় নেই সুমিতা। অশথ গাছের ডালে একটা পেঁচা এসে বসেছে।

—পেঁচা ?

—হ্যাঁ। চল নিচে যাই। এখুনি অন্ধকার হয়ে যাবে।

সর্বেশ্বরের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল সুমিতা।

হঠাৎ তার মনে হল, একটা ছায়ামূর্তির পিছনে সে পদক্ষেপ করছে না তো পাতালের পথে ?

পরক্ষণেই হাত বাড়িয়ে সর্বেশ্বরের হাতখানাকে জোরে চেপে ধরল সুমিতা।

—কি হল? প্রশ্ন করল সর্বেশ্বর।

—কিছু না। চল।

পিসিমা কিন্তু রাজী হলেন না সুমিতার প্রস্তাবে।

রাতে সকলের খাওয়া-দাওয়ার পর পিসিমার ঘরে গেল সুমিতা। সেখানেই কথাটা পাড়ল।

চুপ করে থেকে সুমিতার সব কথা তিনি শুনলেন। তারপর বললেন, তোমরা বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, তোমাদের ভাল-মন্দ হয়তো তোমরাই ভাল বোঝ। আমি সেকেলে মানুষ। আমার কিন্তু মনে হয়, বিবাহ ধর্মেরই একটা অঙ্গ। মন্ত্রোচ্চারণ না হলে তার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়।

মৃদু কণ্ঠে সুমিতা বলল, কিন্তু—

—তুমি যা বলবে তা আমি জানি। লজ্জা-সংকোচের কথা যা তুমি বলেছ তাও আমি ভেবেছি।

—তাহলে? সুমিতা সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

—আমার একটা কথা রাখবে?

—বলুন।

—শুধু তোমরা দুজন কলকাতা চলে যাও। সেখানে একজন কর্মান্বিত ব্রাহ্মণ এনে অগ্নি স্বাক্ষী করে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে তোমরা পরস্পরকে গ্রহণ কর। আর কোন অনুষ্ঠান করার দরকার নেই। তাহলেই আমি খুশি হব।

—তাই হবে। আপনার কথামতই আমরা কাজ করব।

—আর একটা কথা। কয়েক পুরুষ আগেকার একখানা বেনারসী

শাড়ি আছে এ বাড়িতে। রায়বংশের নিয়ম, বিয়ের রাতে নতুন বৌ সেই শাড়ি পড়ে বিয়ের পিড়িতে বসবে, ফুলশয্যার রাত কাটাবে। সেই শাড়িখানা তুমি সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। বিয়ের রাতে পরো। কেমন ?

সুমিতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর হেঁট হয়ে পিসিমাকে প্রণাম করল।

॥ ১১ ॥

পুরোহিত ডেকে বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করে দিলেন পিসিমা।

স্থির হল, গদাধরকে নিয়ে পরদিন সকালের গাড়িতেই সর্বেশ্বর ও সুমিতা কলকাতা রওনা হয়ে যাবে।

সারাদিন একটা অদ্ভুত অস্থিতরতার ভিতর দিয়ে কাটল সর্বেশ্বরের। একটা ঝড় বয়ে চলেছে মনের বনে। নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মত অনেক পথ সে ঘুরেছে জীবনের ঘাটে ঘাটে। আজ আবার চলেছে এক আলোময় উজ্জ্বল উপকূলে নোঙর ফেলতে। সন্মুখে অনেক আশা, অনেক আনন্দের হাতছানি। তবু ফেলে-যাওয়া অতীতের তীর হতে কার একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস যেন বার বার বুকে বাজছে। কার যেন শৃঙ্খল বার বার টানছে পিছন পানে। তাকে স্বীকারও করা যায় না। আবার অস্বীকার যে করবে এমন হৃদয়হীন হৃদয়ই বা সে পাবে কোথায় ?

সবচেয়ে বেশি ভয় সুমিতাকে।

সর্বেশ্বরের কোন কথাই সে শুনতে রাজী হল না। অথচ কত কথাই যে তাকে বলবার ছিল। যে কথার বোঝা পাষাণ-ভার হয়ে চেপে বসেছে সর্বেশ্বরের বুকে। বন্ধ করে দিচ্ছে তার নিঃশ্বাস। অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে সব আনন্দ আর উৎসবের স্রোতমুখ। কিন্তু জীবনের চলার পথে একদিন যখন সেই সব কথার প্রেতমূর্তি অন্ধকার অতীতের গহ্বর হতে বেরিয়ে এসে সুমিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মুখ ভেঙচাবে, তখন কি সেই ভয়ংকর সত্যের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে সুমিতা ? তাদের বিকৃত মুখের হাজারো ভঙ্গীকে কি সহ্য করতে পারবে সে ?

যদি না পারে? সেই সব বীভৎস প্রেতমূর্তির অট্টহাসিতে ভীত ত্রস্ত হয়ে সে যদি ছুটে পালায় সর্বেশ্বরের জীবন-বৃত্তের বাইরে, আজকের আকাশের রামধনু-স্বপ্ন যদি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে মিলিয়ে যায় ব্যর্থ শূন্যতায়, তাহলে?

মনকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছে না সর্বেশ্বর। পাচ্ছে না এতটুকু শান্তি। প্রকাণ্ড রাজবাড়ির কক্ষ হতে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে উদ্‌ভ্রান্তের মত। এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে সবাইকে।

এমনি করে কাটল সারাটা দিন।

পশ্চিম আকাশে মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে অস্ত গেল সন্ধ্যাসূর্য।

পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল সর্বেশ্বর।

ভাবছিল, এ কি ওর অন্তরের অনুরাগের আবির?

না কি অদৃশ্য বেদনার যে গভীর ক্ষত তিল তিল করে চুষে খাচ্ছে ওর রক্ত, অস্থি, মজ্জা, তারই নিঃসৃত রক্তের ধারায় লাল হয়েছে আকাশ-ধরণী?

ছাদের কোণের অশথ গাছের ডালে পাখা ঝটপট করে এসে বসল একটা পেঁচা। গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে উঠল, হুতুম—তুম—

চম্‌কে উঠল সর্বেশ্বর।

আঁধার ঘনতর হয়েছে চারিদিকে।

কেমন যেন ছম্ ছম্ করে উঠল গা।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল সর্বেশ্বর।

সুমিতার ঘরে আলো জ্বলছিল।

ধীরে ধীরে সেই দিকেই পা বাড়াল সর্বেশ্বর।

সুমিতা তখন পিসিমাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। পিসিমা ওর চিবুক স্পর্শ করে সস্নেহে বললেন, চির আয়ুষ্মতি হও মা। স্বামী-

সন্তান নিয়ে সুখী হও। এই ভূতে-পাওয়া রাজবাড়ি আবার হাসি-খুশিতে ঝল্‌মল্ করুক।

শেষের কথাটা কানে যেতেই সর্বেশ্বরের বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠল।

ভূতে-পাওয়া রাজবাড়ি!

রাজবাড়িকে ঘিরে রহস্যময় ছায়ামূর্তির এই অশুভ পরিক্রমণের শেষ হবে কবে? সুস্থ সহজ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আবার কবে ফিরে আসবে এ বাড়িতে? কবে সে নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে স্বস্তির আর শান্তির? কোন দিন পারবে কি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের ভিতর পা দিয়ে সর্বেশ্বর ডাকল, পিসিমা—

—কে? সর্ব? আয়। এই শাড়িটা সুমিতাকে দিয়ে দিলাম। বিয়ের রাতে ওকে পরতে হবে। তুই একটু মনে করিয়ে দিস।

সুমিতার হাতের উপর চোখ পড়ল সর্বেশ্বরের।

বহুমূল্য বেনারসী শাড়ি একখানা। টক টক করছে তার রক্ত-বর্ণ। মাঝে মাঝে সোনালী চুমকির কাজ করা। যেন বিদ্যুতের ঝিলিক সন্ধ্যার রক্তমেঘে।

সর্বেশ্বরের চকিতে মনে পড়ে গেল, ওই রক্তরাঙা বেনারসী শাড়ি পরা আর একটি মানুষের সঙ্গে একদিন ওর শুভদৃষ্টি হয়েছিল। দুটি ভীরু চোখের লজ্জানত দৃষ্টিতে সেদিন ফুটে উঠেছিল একটি উদ্ভিন্ন যৌবনার কত আশা ও আনন্দের স্বপ্ন। তারপর কোন্ দুর্দৈবের ঝড়ে অকালে মিলিয়ে গেল সে চোখের স্বপ্ন-রঙ।

উন্মাদের অর্থহীন দৃষ্টির মাতাল পদক্ষেপে আবিল হয়ে গেল সে চোখের তারা। রূপ-রস-গন্ধে ভরা এই সুন্দর পৃথিবী থেকে নির্বাসিত হয়ে কোন্ আশাহীন অন্ধকার গহ্বরে আজো সে জীবনের দিন গুনছে! তার নীরব অশ্রুজল কি তিল তিল হয়ে জমে আছে

ওই স্বর্ণখচিত রক্তাক্ত বেনারসীর ভাঁজে ভাঁজে? ওই বেনারসীতে তনুলতা আবরণ করতে যেয়ে কি অশ্রুজলের দুর্বার স্রোতে ভেসে যাবে সুমিতা?

ভীতকণ্ঠে সর্বেশ্বর বলল, ওই শাড়ি কি সেদিন না পরলেই নয় পিসিমা?

পিসিমা বুঝি বুঝলেন ওর মনের গোপন একটি কথা। সস্নেহে বললেন, তুই তো জানিস সর্ব, বিয়ের রাতে এই বেনারসী পরা এ বাড়ির অনেক দিনের প্রথা। নারে, সে কুলপ্রথাকে ভাঙতে নেই।

একটু থেমে পিসিমা আবার বললেন, কিরে, আমার কথা মনে থাকবে তো?

সর্বেশ্বর ঘাড় নেড়ে জানাল, থাকবে।

—আরো একটা প্রথার কথা তোর মনে আছে তো?

—আছে পিসিমা।

—কালই যখন তোরা চলে যাচ্ছিস তখন পাতাল ঘরের গুপ্ত পথের সন্ধানটাও আজই ওকে জানিয়ে দিস, কেমন?

কথাটা বলেই একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সর্বেশ্বরের দিকে তাকালেন পিসিমা। সর্বেশ্বর কোন কথা বলল না। শুধু ঘাড় নাড়ল।

একটু চুপ করে থেকে পিসিমা বললেন, তোমরা তাহলে জিনিষ-পত্র সব গুছিয়ে নাও। আমি যাই।

পিসিমা চলে গেলেন।

সুমিতা ও সর্বেশ্বর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। সুমিতার চোখে হাসির ঝিলিক্। সর্বেশ্বর বুকের তলের উদ্গত দীর্ঘনিশ্বাসকে সবলে চেপে ধরে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সুমিতার দিকে।

রাত্রে পাথরের বারান্দায় খানিক গল্প-গুজবের পর ওদের দুজনকে শুতে যেতে বলে পিসিমা চলে গেলেন তাঁর ঘরে।

ওরা দুজন তবু আরো কিছুক্ষণ বসে রইল।

চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। অথবা কথা আছে, ভাষা নেই।

সুমিতা বলল, এবার তুমি শুতে যাও। গুড নাইট।

সর্বেশ্বর বলল, সুমিতা, তুমি তো শেলী পড়েছ?

সুমিতা জবাব দিল, তাতো পড়েছি। কেন বল তো?

—তোমার মনে পড়ল না শেলীর কথা?

—কি কথা?

—'ডু নট সে গুড নাইট। দ্য নাইট দ্যাট সেপারেটস্ আস্ ক্যান নট বি গুড।'

হেসে উঠল সুমিতা, ওঃ, এই কথা। কিন্তু শেলীর ও কথা আজকের রাতের বেলা খাটে না।

—কেন?

—আজকের 'সেপারেশন' যে পরিপূর্ণ মিলনের অগ্রদূত। তাই এ রাত চিরকালের শুভরাত—শুভদৃষ্টির অগ্রদূত।

শুভদৃষ্টি!

দুটি সজল নয়নের ছবি ভেসে উঠল সর্বেশ্বরের চোখে।

দুই হাতে চোখটা ভাল করে রগড়ে সর্বেশ্বর আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, তুমি আমার সঙ্গে একটু এস সুমিতা।

—কোথায়?

—হলঘরে।

—কেন বল তো?

—কাজ আছে।

—কিন্তু রাত অনেক হয়েছে। কাল সকালেই যে বেরুতে হবে?

—সকালে বেরুতে হবে বলেই তো তোমাকে ডাকছি। একটা কুলপ্রথা সেরে নিতে হবে।

—কি কুলপ্রথা ?

—আমার সঙ্গে চল। গেলেই বুঝতে পারবে।

সবিস্ময় কৌতূহলে সুমিতা সর্বেশ্বরের পিছনে পিছনে চলল।

হলঘরের এক কোণে সিলিং থেকে ঝোলানো 'চোদ্দ লাইট'টা মিট মিট করে জ্বলছে। তার আলো প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে ঝোলানো ঝাড়-লণ্ঠনের প্রতিটি স্ফটিক খণ্ডে। ফলে বিস্তৃত হলঘরটি জুড়ে অস্পষ্ট আলো-আঁধারের একটা রহস্যময় আবহাওয়া ফুটে উঠেছে।

সর্বেশ্বর এগিয়ে যেয়ে দেওয়ালের গা থেকে বাঘের মাথাটা সরিয়ে নিল। তামার হাতলটা চেপে ধরল দৃঢ় মুঠিতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মেঝের খানিকটা পাথর সরে যেয়ে একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গের পথ দেখা দিল।

তামার হাতলটায় হাত রেখেই সর্বেশ্বর বলল, দেখ সুমিতা, এই হল এ বাড়ির পাতাল ঘরের সুড়ঙ্গ পথের গুপ্ত দরজার সংকেত।

সুমিতা এতক্ষণ বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে সর্বেশ্বরের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। এবার তার কথা শুনে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে সুড়ঙ্গ পথের উপর ঝুঁকে দাঁড়াল।

সর্বেশ্বর বলল, কিছুই দেখতে পাবে না সুমিতা। নিচে অতলস্পর্শ গহ্বর। শেষ হয়েছে পাতাল ঘরে।

চমকে প্রশ্ন করল সুমিতা, পাতাল ঘর ? এরই কথা কি পিসিমা আমাকে বলছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমাকে এ সব দেখানোর মানে কি ? কি আছে ওই পাতাল ঘরে ?

দেয়ালের হাতল ঘুরিয়ে সুড়ঙ্গ পথের মুখ বন্ধ করে দিয়ে সুমিতার

কাছে এসে দাঁড়াল সর্বেশ্বর। বলল, সে এক ইতিহাস সুমিতা। একদিন সময়মত সবই তোমাকে বলব। আজ শুধু এইটুকু শুনে রাখ যে, এদেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হবার অনেক আগেই এ বাড়ি তৈরী হয়েছিল। তখন এর নাম ছিল 'রায়গড়'। একদা বর্গীর হাঙ্গামা দমন উপলক্ষ্যে আদরের নাতি সিরাজদ্দৌল্লাকে সঙ্গে নিয়ে রায়গড়ের অতিথি হয়েছিলেন বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি খাঁ। আর তারি ফলে রায়গড়ের সুসজ্জিত হলঘরের অনেক নিচে গোপনে নির্মিত হল এক গুপ্তকক্ষ—পাতালঘর।

সুমিতা প্রশ্ন করল, কিন্তু নবাব বা নবাব-নাতির আতিথ্যের সঙ্গে পাতাল ঘরের সম্পর্ক কি তাতো বুঝলাম না।

সর্বেশ্বর বলল, অতি পুরাতন কথা। ভাবী নবাবের লোলুপ দৃষ্টি পড়ল রায়গড়ের অসামান্যা রূপসী কুললক্ষ্মীর উপর। আর সেই দৃষ্টির আগুন থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্যই তৈরী হল পাতাল ঘর। সেই ঘরে বৌ-রাণীকে লুকিয়ে রেখে বাইরে রটিয়ে দেওয়া হল তাঁর মৃত্যু সংবাদ। নবাব-নাতি রায়গড়ের কক্ষ হতে কক্ষান্তরে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও তাঁর সন্ধান না পেয়ে ব্যর্থ আক্রোশ বুকে চেপে রাজধানী মুকশুদাবাদে ফিরে গেলেন। আর সেইদিন থেকেই রায়গড়ের প্রত্যেক বংশধরের প্রতি এই নির্দেশ দেওয়া হল যে বিয়ের রাতেই নববধূকে পাতাল ঘরে প্রবেশের গুপ্ত সংকেত জানিয়ে দিতে হবে। আর সে সংকেত জানবে শুধুমাত্র দুটি প্রাণী—রায়গড়ের দখলদার আর তার পত্নী। সেই কুলপ্রথা আজো চলে আসছে।

একমনে এই পুরাকাহিনী শুনছিল সুমিতা। শুনতে অনেকটা রূপকথার মতই লাগছিল তার কাণে। কিন্তু দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মাঝখানে এই বিশাল জীর্ণ রাজবাড়ি, ঝাড়-লণ্ঠন-ব্যাঘ্রচর্ম-দেয়াল-চিত্র সজ্জিত এই হলঘর, চৌদ্দলাইট-এর মৃদু আলোর আল্পনা—সব মিলিয়ে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে সুমিতার মনে যার

পশ্চাৎপটে সর্বেশ্বরের কাহিনীর রূপকথা যেন বাস্তবের মূর্তি ধরে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুমিতা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, বর্গীর হাঙ্গামার পরে আর কোন কূলবধূকে কি কখনো আশ্রয় নিতে হয়েছে ওই পাতাল-ঘরে? তেমন কোন শোচনীয় দুর্দৈব কি আর কখনো ঘটেছে রায়বংশের ইতিহাসে?

কি জবাব দেবে সর্বেশ্বর?

সত্য বলবে? না মিথ্যে?

সত্য বললে যদি বিরূপ হয় সুমিতার মন? যদি তার স্বপ্ন-মিনার ভেঙে চুরমার হয়ে যায় সেই সত্যের রূঢ় আঘাতে?

না না, নিজের মনেই আশ্বাস খোঁজে সর্বেশ্বর, আজকের এই একটি রাত্রির জন্য সে ঝুঁকি সে কিছুতেই নেবে না। মিথ্যের আবরণেই ঢেকে থাক আজকের রাত। তারপর কালই তো ছেড়ে যাবে এই রাজবাড়ি। পিছনে পড়ে থাকবে পাতালঘরের অশ্রুসিক্ত কাহিনী। আর কখনো সুমিতাকে নিয়ে ফিরবে না পিতৃপুরুষের এই বিশাল পুরীতে। আর কখনো তাকে সুমিতার এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে না।

সর্বেশ্বর আম্‌তা আম্‌তা করে বলল, না না, মানে আর কাউকে কখনো পাতাল ঘরে আশ্রয় নিতে হয়নি। তারপরেই তো নবাবী আমল ফুরিয়ে গেল। শুরু হল ইংরেজের রাজত্ব। রায়গড়ের গদির মালিক পেল রাজা খেতাব। রায়গড় হল রাজবাড়ি। পাতাল-ঘর ঢাকা পড়ে রইল ইতিহাসের অতীত অন্ধকারে। একটা ক্ষীণ কূলপ্রথা ছাড়া তার আর কোন অস্তিত্বই রইল না কারো কাছে।

সর্বেশ্বরের আরো কাছে সরে গিয়ে সুমিতা আবেগমধুর গলায় বলে উঠল, উঃ, তোমার কথা শুনে যে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার।

—কেন বল তো?

—পাতালঘরের কাহিনী শুনতে শুনতে এতক্ষণ আমার কি মনে হচ্ছিল জান ?

—কি ?

—আমি যেন ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে নেমে যাচ্ছি ওই পাতালঘরের অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে। যেন একটা বিরাট কালো হাঁ আমাকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে।

হো হো করে হেসে উঠল সর্বেশ্বর। বলল, নাঃ, বৃথাই তুমি বি, এ, পাশ করেছ সুমিতা। একটা স্কুলের ছোট মেয়েও যে তোমার চেয়ে বেশি সাহস রাখে। কিন্তু আর এখানে নয়। রাত অনেক হয়েছে। শোবে চল।

দুজনে হাতে হাত ধরে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল। সুমিতা ঘরের কাছে এসে কি ভেবে হঠাৎ সর্বেশ্বরের পায়ের উপর মাথা রেখে তাকে প্রণাম করল।

সর্বেশ্বর তাকে তুলে ধরে হেসে বলল, এটা কি হল ?

সুমিতা হেসে বলল, কিছু না। তুমি শুতে যাও। আবার দেখা হবে কাল সকালে।

—তাই বুঝি ?

সর্বেশ্বর হাসতে হাসতে বারান্দা পার হয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ ১২ ॥

'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত মত নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।'

একটা গানের কলি গুন্‌গুন্‌ করতে করতে নিজের ঘরে ঢুকল সুমিতা।

মধুর আবেগে আচ্ছন্ন তার মন। স্বপ্নের পালে খুশির হাওয়া লেগেছে যেন। জীবনের তরী বয়ে চলেছে তর্‌তর্‌ করে।

খোলা জানালা পথে চোখে পড়ে দিগন্ত-আকাশ। মহুয়া গাছটার মাথার উপর দিয়ে চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। একটা ম্লান আভা স্বপ্নময় করে তুলেছে দিগন্ত রেখাকে।

সেই দিকে চেয়ে চেয়ে গুন্‌গুন্‌ করে গাইতে লাগল সুমিতা। 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মত নাচেরে।'

গাইতে গাইতেই খুশির জোয়ারে ভাসতে ভাসতে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। স্তব্ধ দেহ-মন দিয়ে সে স্বাদ নিতে চাইল ওর অন্তহীন আনন্দের।

শুয়ে শুয়ে এক সময় কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, সুমিতা নিজেই টের পায়নি। সারা দিনের উত্তেজনায় ক্লান্ত দেহ গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ল।

রাত বাড়ে।

অন্ধকারের কালো ডানা ধীরে ধীরে ঢেকে দেয় পৃথিবীকে।

হিমেল বাতাসে কার্তিকের ক্লান্ত শ্বাস ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে।

স্তব্ধ হতে স্তব্ধতর হয় রাজবাড়ির কক্ষ হতে কক্ষান্তর।

আর সেই স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার গহ্বর হতে বুঝি বেরিয়ে আসে সুদূর অতীত রায়গড়ের আত্মার দল।

অস্পষ্ট মৃদু পদধ্বনি জাগিয়ে রাজবাড়ির পাষাণ চত্বর বেয়ে এগিয়ে আসে রাত্রিচর ছায়ামূর্তি।

খুলে গেল হলঘরের দরজা।

শংকিত পায়ে বেরিয়ে এল বস্ত্রাবৃত এক নারীমূর্তি। টানা বারান্দার এদিক-ওদিক একবার দেখল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে। তারপর এগিয়ে চলল বারান্দা ধরে।

সুমিত্রার ঘরের দরজা খোলাই ছিল। ভিতরে আলো জ্বলছে। সেই ঘরেই ঢুকে পড়ল নারীমূর্তি।

ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের ছায়া পড়তেই ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠল তার দৃষ্টি। এগিয়ে গেল ড্রেসিং টেবিলের কাছে।

চমকে উঠল নারীমূর্তি।

রক্তলাল বেনারসীখানি টেবিলের উপরেই ভাঁজ করা রয়েছে।

শীর্ণ আঙুলগুলি দিয়ে শাড়িখানি চেপে ধরল নারীমূর্তি। চোখে-মুখে ফুটে উঠল কামনার তীব্র ছটা। একটানে মেঝেয় ছড়িয়ে ফেলল শাড়িটা। সোনালি জরির ফুল-পাতাগুলো সেজবাতির মৃদু আলোয় যেন সাপের মাথার মণির মত ঝিকমিকিয়ে উঠল।

হঠাৎ কি মনে হল, পরম আদরে কাপড়খানাকে দুই মুঠোয় ভরে নিয়ে বুকে চেপে ধরল। গভীর আবেশে চোখ বুঁজে এল। তারপরই চোখ মেলে ত্রস্ত হাতে এলোমেলো ভাবে শাড়িটাকে জড়িয়ে নিল সারা গায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে আয়নায় দেখতে লাগল নিজের শাড়ি-জড়ানো দেহটা। খুশির আমেজ ফুটে উঠল চোখে-মুখে। সলাজ হাতে শাড়ির প্রান্ত তুলে দিল মাথায়। আধ-ঘোমটায় আবরিত হল বিচ্ছৃংখল কেশভার। আয়নায় সিঁথির সিঁদুরের মোটা দাগটার ছায়া ঢেকে গেল।

দেখতে দেখতে আবার হিংস্র হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি। স্ফুরিত হতে লাগল নাসারন্ধ্র। ক্রুদ্ধ ঈগলের উদ্যত নখরের মত বেঁকে বেঁকে উঠতে লাগল দুই হাতের দশটি শীর্ণ আঙুল।

একটানে ফেলে দিল মাথার ঘোমটা। খুলে ফেলল বেনারসীর আবরণ। ভয়ংকর হিংস্রতায় ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল বহুমূল্য বেনারসী। মুখ দিয়ে বের হতে লাগল অবরুদ্ধ আক্রোশের একটা অস্পষ্ট চাপা আর্তনাদের গোঙানি।

সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সুমিতার।

চোখ খুলতেই সেই ভয়ংকর মূর্তির পৈশাচিক কাণ্ড দেখে আতংকের একটা অর্থহীন শব্দ বের হল তার মুখ দিয়ে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চকিতে সুমিতার দিকে ফিরে তাকাল নারীমূর্তি। খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, আমার বেনারসী পরতে এসেছ! রাণী হবার শখ হয়েছে?

বলতে বলতে সেই নারীমূর্তি তীব্র জীঘাংসায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সুমিতার বিস্ময়বিমূঢ় দেহের উপর। প্রেতিনীর মত দুই শীর্ণ বাহু দিয়ে চেপে ধরল তার কণ্ঠনালী।

শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে চীৎকার করে উঠল সুমিতা, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমাকে—

আত্মরক্ষার আদিম প্রেরণায় সহসা যেন অনেকশক্তি লাভ করেছে সুমিতা। এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সে বলল, কে? কে তুমি?

—আমি? হিঃ হিঃ হিঃ—

প্রেতিনীর মত হাসতে হাসতে ভৌতিক ছায়ার মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নারীমূর্তি।

অপরিসীম বিস্ময় ও গভীর উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল সুমিতা।

একটু পরেই ঘরে ঢুকল সর্বেশ্বর।

সুমিতা ভীতা হরিণীর মত তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, সেই ছায়া-মূর্তি আজ আমার ঘরেও এসেছিল।

সর্বেশ্বর বিস্মিত হল না এ কথায়। বলল, জানি।

বিস্মিত হল সুমিতা। বলল, কেমন করে জানলে ?

—তোমার ঘরে আসতে আসতেই দেখলাম তাকে চলে যেতে।

—সে কি ?

—হ্যাঁ। কি জান সুমিতা, দোষটা আমারি। আরো সতর্ক থাকা আমার উচিত ছিল।

—মানে ?

—আগে থেকেই আমার মনে হয়েছিল ছায়ামূর্তি আজ রাতে তোমার ঘরে আসতে পারে।

অবাক বিস্ময়ে সর্বেশ্বরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সুমিতা। এ কি কোন প্রেতসিদ্ধ কাপালিক ? নইলে প্রেতলোকের ছায়ামূর্তির গতিবিধির আভাস এ পায় কেমন করে ?

সর্বেশ্বর বলতে লাগল, সেই ভেবেই নিজের ঘরে না শুয়ে আজ আমি হলঘরেই শুয়েছিলাম। জেগেই ছিলাম এতক্ষণ। হঠাৎ কখন তন্দ্রা এসে ঢেকে দিয়েছিল চোখের পাতা। আর সেই অবসরে ছায়ামূর্তি এসে ঢুকেছে তোমার ঘরে।

—কি বলছ তুমি ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—কি বুঝতে পারছ না ?

—এই সব ভৌতিক ছায়ামূর্তি—

বাধা দিল সর্বেশ্বর, ভৌতিক ছায়ামূর্তি নয় সুমিতা, তোমার আমার মত রক্তমাংসের মানুষ।

আঁতকে উঠল সুমিতা, মানুষ ? তুমি তাকে চেন ?

—এত বেশি বুঝি আর কাউকে চিনি নি।

একটু চুপ করে কি যেন ভাবল সুমিতা।

তারপর প্রশ্ন করল, সেই মানুষই কি তোমার ঘরে আগুন ধরিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—সেই কি খুন করেছিল রমানাথবাবুকে?

—হ্যাঁ।

—সেই কি আজ এসেছিল আমাকে খুন করতে?

—সম্ভবত।

—তাহলে কে? কে সেই নারী?

—ইন্দ্রাণীর মা।

চোখের সামনে একটা বিকৃতদর্শন কবন্ধ দেখলেও বুঝি এত আতংক, এত বিস্ময় জাগে না মানুষের মনে। মুহূর্তের জন্য যেন চেতনা লোপ পেল সুমিতার। পরমুহূর্তে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে সে কথা বলল, অর্থাৎ তোমার—

—স্ত্রী।

—সে তো মারা গেছে।

—কে বলেছে তোমাকে?

—কেউ বলে নি। কিন্তু আমি তো তাই জানি।

—তুমি ভুল জেনেছ।

গভীর হতাশায় যেন ভেঙে পড়ল সুমিতা। তার বুকের ভিতর থেকে অসহায় দীর্ঘশ্বাসের মত বেরিয়ে এল একটি মাত্র প্রশ্ন, এ কথা তুমি আমাকে এতদিন বলো নি কেন? কেন আমাকে জানতে দাও নি যে তোমার স্ত্রী আছে? কেন তুমি এমন করে আমাকে ঠকিয়েছ?

—তুমি ভুল করছ সুমিতা। আমি তোমাকে ঠকাই নি। কাউকেই কখনো ঠকাইনি।

—তবে কেন একথা আমাকে বলো নি?

—আমি তো বলতে চেয়েছিলাম। তুমিই শুনতে চাওনি। তাছাড়া, বিশ্বাস করো সুমিতা, যেদিন সব কথা তোমাকে খুলে

বলতে চেয়েছিলাম, তারপর যতই দিন যেতে লাগল ততই সব কথা তোমাকে খুলে বলবার সাহস আমি হারিয়ে ফেলতে লাগলাম।

সুমিতা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

—কেবলি ভয় হতে লাগল, পাছে সব শুনে সব জেনে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও। তাই বলি বলি করেও কোন কথাই তোমাকে বলতে পারিনি।

—আজো কি সে ভয় আছে?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো আছে।

—কিন্তু আজ যে সব কথা জানা আমার একান্ত দরকার।

—সবই তোমাকে বলব সুমিতা। সব কথা তুমি শোন। তারপর আমার ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটুক।

সুমিতা চুপ করে রইল।

সর্বেশ্বর জানালার পাশে যেয়ে বাইরে মেলে দিল অসহায় চোখের দৃষ্টি। দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত খোলা মাঠ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়ের ভৌতিক অবস্থিতি। কোথাও কোথাও দু চারটি মাথা-উঁচু গাছের পাহারা।

দুই হাতে জানালার দুটি শিক শক্ত মুঠিতে ধরে সর্বেশ্বর বলতে লাগল ভাগ্যবিড়ম্বিতা একটি নারীর শোচনীয় জীবন-কাহিনী।

—কর-রেখা বিচার করতে জানতেন আমার বাবা। জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল যথেষ্ট। অনেক ঘুরে, অনেক খুঁজে, অনেক হাত মিলিয়ে, আর অনেক কোষ্ঠি বিচার করে এক মধ্যবিত্ত ঘর থেকেই তিনি সুনন্দাকে পুত্রবধূ করে এনেছিলেন।

সুনন্দার রূপের খ্যাতি ছিল। এমন সুন্দরী বধূ নাকি রাজবাড়িতে কদাচিৎ এসেছে। কিন্তু রূপের চেয়েও সুন্দর ছিল সুনন্দার মন।

নরম। কোমল। যেন পদ্মপত্রে নীড়। একটুকু ছোঁয়া লাগলেই থরথর করে কাঁপে। একটু রোদ লাগলেই ঝল্‌মল্‌ করে। একটু হাওয়াতেই ঝরে পড়ে। তার রূপে যদি বা চোখ মজেছিল, মনে মজল মন।

হায়রে! তখন কি জানতাম সেই ফুলের মত নরম মনই তার কাল হবে। বিষাক্ত কীটের একটি দংশনে কালো হয়ে যাবে তার জীবনের সব পাপড়ি!

কথা থামিয়ে একটু ম্লান হেসে সর্বেশ্বর বলল, এই দেখ, কবিত্ব শুরু করে দিলাম। কি জান, সেদিনের কথা বলতে গেলেই সেই তরুণ মনটা ফিরে আসে আমার মধ্যে। কিন্তু সে কথা থাক। আসল কথা শোন।

বিয়ের পর দুটো বছর সুখেই কাটল। সুনন্দা যেন একটা নরম মাধবীলতার মতই আমাকে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে জড়িয়ে ধরল। আর আমারও মনকে ভরে দিল ফুলের সৌরভে।

তারপরই ঘটল দুর্ঘটনা।

কয়েকদিনের জন্য বাপের বাড়িতে গেল সুনন্দা। রাজবাড়ির বৌরাণী হয়ে আসবার পর মধ্যবিত্ত বাপের বাড়ি যাবার আর কোন সুযোগ ঘটেনি। এ নিয়ে বাইরে কোন অনুযোগ না জানালেও আপন মনে সে চোখের জল ফেলত। সেই চোখের জল আমি সইতে পারলাম না। মাকে বলে ওর বাপের বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করে দিলাম। আজ মনে হয়, ব্যবস্থাটা না করে দিলেই বুঝি ভাল হত।

সুমিতা প্রশ্ন করল, কেন?

—সুনন্দার বাপের বাড়ির প্রতিবেশীরা বড়লোক। গাঁয়ের মাতব্বর স্থানীয়। কি পূজা উপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে যাত্রাদল গিয়েছিল গান করতে। অন্য সকলের সঙ্গে সুনন্দাও গিয়েছিল

যাত্রা দেখতে। গ্রাম-সমাজে চিকের আড়ালের কোন ব্যবস্থা ছিল না। পুরুষদের আসন সর্ব প্রশস্ত উঠোনে। আর মেয়েদের বসবার আসন ছিল সব ঘরের দাওয়ায়। সেইখানে বসেই তন্ময় হয়ে গান শুনছিল সুনন্দা। হঠাৎ কি প্রয়োজনে কিছুক্ষণের জন্য ও বাড়ি ফিরে গেল। ওর বাবা বাড়িতেই ছিলেন। দুষ্ট গ্রহের প্রভাবেই হোক আর পাশাপাশি বাড়ি বলেই হোক, ও একাই বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। গান ফেলে কেউ আর ওর সঙ্গে যায়নি। রমানাথও ওদের পাড়া-প্রতিবেশী। ছোটবেলায় এক সঙ্গে খেলাধুলা করেছে। হয়তো কিশোর মনের কিছু মন দেওয়া-নেওয়ার খেলাও ছিল। কিন্তু সে যে বিষাক্ত সাপের ঘৃণিত ছোবল বুকের ভিতর পুষে রেখে বিষ ঢালবার সুযোগের সন্ধানে ছিল তা কে জানত! সুনন্দাকে একা একা যাত্রার আসর থেকে উঠে আসতে দেখে রমানাথও সকলের অলক্ষ্যে ওর পিছু নিল। দুই বাড়ির খিড়কির মাঝখানে ছিল একটা ছোট বাগান। সেখান দিয়েই মেয়েদের যাতায়াত ছিল। সেই নির্জন বাগানে অকস্মাৎ অতর্কিতে এসে রমানাথ ওর পথ আটকে দাঁড়াল। সুনন্দা ভয়ে চীৎকার করবার আগেই শয়তানের বলিষ্ঠ হাতে রমানাথ ওর মুখটাকে সজোরে চেপে ধরল। সুনন্দা ধর্ষিতা হল।

সুমিতা আর্তনাদ করে উঠল। দুই হাতে মাথাটাকে চেপে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সর্বেশ্বর। একটা পেঁচার কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে এল বাতাসে।

কিছুক্ষণ দুজনই চুপ করে রইল। এক সময়ে সর্বেশ্বর আবার বলতে সুরু করল।

—সেই রাতেই শয্যা নিল সুনন্দা। কাউকে কিছু বলল না। কিন্তু ত্যাগ করল আহার-নিদ্রা। ওর বাবা-মা, আত্মীয়-বন্ধু অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ও শুধু নীরবে চোখের জল ফেলল।

নিরুপায় হয়ে ওর বাবা ওকে রেখে গেলেন রাজবাড়িতে। রাতে আমাদের দেখা হল। কিন্তু সে আমি কাকে দেখলাম ? সুনন্দা ? না তার প্রেতমূর্তি ?

অনেক বোঝালাম। অনেক কথা বললাম। ও নিরুত্তর। পাষানের মত নিষ্পলক দুটি সজল অর্থহীন চোখ তুলে ও শুধু তাকিয়ে রইল আমার দিকে। অনেক অনুনয়—অনুরোধেও এল না আমার শয্যায়। মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে কাটাতে লাগল যন্ত্রণাবিকৃত রাত।

অনেক সহ্য করলাম আমি। কিন্তু একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। রূঢ় কণ্ঠে কটু কথা বললাম সুনন্দাকে। সেইদিন প্রথম মুখ খুলল সুনন্দা। সব কথা খুলে বলল। ওর সব ব্যথা।

দুঃসহ যন্ত্রণা নীরবে সয়ে সব শুনলাম। কোন কথা বললাম না। না কটু বাক্য। না সান্ত্বনার বাণী। সংসার থেকে গুটিয়ে নিলাম নিজেকে। শুধু সুনন্দার কাছ থেকে নয়। পৃথিবীর কাছ থেকেও। একদিনে যেন কালো হয়ে গেল পৃথিবীর রঙ। কোন্ নিষ্ঠুর দানব যেন নিঃশেষে নিঙড়ে নিল জীবনের সব রস।

এমনি করেই হয়তো দিন চলতো। গড়িয়ে যেতো কালের চাকা। কিন্তু অকরুণ ভাগ্যবিধাতার বুঝি তাও সইল না। তার হাতে উদ্যত হল নতুন বজ্র। সুনন্দার সন্তান-সম্ভাবনার লক্ষণ দেখা দিল।

কিন্তু কার সন্তান ?

সুনন্দার মনে বদ্ধমূল ধারণা হল, এ সন্তান রমানাথের পাশবিক অত্যাচারের ফল। বিষামৃত। আমি অনেক বোঝালাম। কিন্তু বৃথা।

সেই থেকেই সুনন্দার মস্তিষ্কের বিকার দেখা দিল।

প্রথমে ছোটখাট অস্বাভাবিকতা। একটু বা ছিটের লক্ষণ। সর্বদা একা একা থাকে। কারো সঙ্গে কথা বলে না। অকারণেই

হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে। আবার কখনো বা সম্পূর্ণ সুস্থ, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

তারপর সুনন্দার কোল জুড়ে এল ইন্দ্রাণী। সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিল। কচি মেয়েকে সব সময় ঘিরে রাখে নিজের বুক দিয়ে। কাউকে ঘেঁসতে দেয় না তার কাছে। এমন কি আমাকেও নয়। সর্বদাই তার মনে আতংক, পৃথিবীশুদ্ধ সবাই ওঁৎ পেতে রয়েছে ইন্দ্রাণীকে মেরে ফেলবার জন্য। যত বোঝাতে চাইলাম যে এ তার মিথ্যা ধারণা, ততই তার আশংকা বাড়তে লাগল দিনের পর দিন। সুনন্দা সত্যি পাগল হয়ে গেল।

চিকিৎসার কোন ত্রুটি হল না। প্রথমে কলকাতা। তারপর রাঁচি। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। এমনিতে শান্ত শিষ্ট, প্রায় সুস্থ মানুষ। শুধু একটু উদাসীন, একটু বা অন্যমনস্ক। কিন্তু মাঝে মাঝেই কেমন যেন বদলে যায়। ইন্দ্রাণীকে বুকে চেপে ধরে থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে। ধীরে ধীরে বদলে যায় তার মুখ, চোখ, নাক। বিকৃত হয়ে যায় সারা দেহ। কথায়-বার্তায়, আচার-আচরণে ফুটে ওঠে একটিমাত্র আশংকা—এই বুঝি তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ইন্দ্রাণীকে—বুঝি তাকে হত্যা করল—

তবু ইন্দ্রাণীকে সত্যি একদিন ছিনিয়ে নিতে হল ঘুমন্ত সুনন্দার পাশ থেকে। এমন বদ্ধ উন্মাদের কাছে তো রাখা চলে না কচি শিশুকে। কি জানি কি খেয়ালের বশে কখন কোন্ দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে।

সেদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে পাশের শূন্য বিছানা দেখেই আর্ত-কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সুনন্দা, ইন্দ্রাণী—আমার রাণী—

আর কিছু বলতে পারল না সুনন্দা। দুঃসহ আবেগে কাঁপতে লাগল তার দেহ। আকুঞ্চিত হতে লাগল দেহের শিরা-উপশিরা। অর্থহীনভাবে ঘুরতে লাগল ভীতি-বিস্ফারিত দুটি অক্ষি-গোলক।

হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে মুর্ছিতা হয়ে সে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

আর সেই রাতেই তাকে নির্বাসন দেওয়া হল পাতাল ঘরে।

কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে উঠল সর্বেশ্বরের। বুঝিবা অবরুদ্ধ হল গভীর ব্যথায়।

সুমিতা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, পাতাল ঘর ?

—হ্যাঁ, পাতাল ঘর। কয়েক ঘণ্টা আগেই যে ঘরের গুপ্ত পথের সন্ধান তোমাকে দেখিয়েছিলাম।

—তবে যে তখন তুমি বললে, পাতাল ঘরের সৃষ্টি থেকে মাত্র একজন ছাড়া আর কাউকে থাকতে হয়নি সে ঘরে।

—সেটা মিথ্যে কথা সুমিতা। তখন তোমাকে সত্য বলবার সাহস আমার ছিল না।

একটু চুপ করে থেকে সুমিতা বলল, আচ্ছা, এখন একটা সত্য কথা আমাকে বলবে ?

—বল কি জানতে চাও ?

—তোমার-আমার সকলের জীবন এমন বিপন্ন জেনেও কেন সেই উন্মাদিনীকে একেবারে বন্দিনী করে রাখো নি পাতাল ঘরে ? কেন তার বাইরে আসবার পথ খুলে রেখেছ ?

—কারণ ততটা অমানুষ আমি হতে পারি নি সুমিতা। কোন ঘরে আটকে রাখলে অথবা হাতে পায়ে শিকল লাগালে সুনন্দার চেহারার এমন উৎকট রূপান্তর ঘটে, খাঁচায় আটকানো পশুর মত এমন নির্দয়ভাবে সে মাথা খুঁড়তে থাকে যে সে দৃশ্য আমি সইতে পারি না। তাই ওই পাতাল ঘরে একটি মাত্র ঝি সঙ্গে দিয়ে তাকে রেখে দিয়েছি।

—কিন্তু এতে লাভ কি হয়েছে ?

—আর কিছু না হোক, অন্তত এইটুকু সান্ত্বনা আমার আছে যে

একদিন যাকে সারা অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলাম, তার চরমতম দুর্দিনে আমার হাতে সে অনিবার্য প্রয়োজনের চেয়ে এতটুকু বেশি লাঞ্ছিত হয় নি। তাছাড়া সুনন্দার যে হিংস্র নরঘাতী রূপ তুমি পর পর দেখলে, তুমি এ বাড়িতে আসবার আগে এমন অমানুষিক চেহারা তার কখনো ছিল না। জীবনে সব কিছু হারিয়ে একান্ত অসহায় একটি উন্মাদিনীর মতই সে নিজেকে গুটিয়ে রাখত পাতাল ঘরের নির্জন অন্ধকারে। শুধু মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসত গভীর রাতে সকলের অলক্ষ্যে। দূর থেকে অপলক নয়নে চেয়ে থাকত রাণীর দিকে। তারপর লোকজনের সাড়া পেলেই স্খলিত পায়ে দ্রুত বেগে চলে যেত পাতাল ঘরের পথে। তাইতো তার হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে তাকে আটকে রাখবার দরকার হয় নি।

সর্বেশ্বর চুপ করল। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সুমিতার মুখের দিকে ভাল করে চাইলে সে দেখতে পেত যে তার মনের ভিতর চলেছে এক প্রচণ্ড ঝড়। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে অনেক কষ্টে সে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করছে।

একটু পরে সুমিতা বলল, আমিই তাহলে যত অনর্থের মূল?

চমকে উঠল সর্বেশ্বর। বলল, না না, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার এতে এতটুকু দায়িত্ব নেই সুমিতা। আমি শুধু আসল ঘটনাটাই তোমাকে খুলে বলেছি। তোমার উপরে এতটুকু দোষারোপ করবার কথা যে আজ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না তা তো তুমি জান সুমিতা।

সর্বেশ্বরের কথা শুনতে শুনতে ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল সুমিতার মুখের রেখা। একটা দৃঢ় সংকল্প মনের গভীরতা থেকে উঠে এসে ছায়া ফেলল তার মুখে।

ম্লান হেসে সে বলল, আপনার এ মহানুভবতা প্রসংশনীয় মিঃ রায়।

মিঃ রায়।

চম্‌কে উঠল সর্বেশ্বর। নতুন করে আর একবার যেন মুচড়ে উঠল তার হৃদপিণ্ডটা। গুলিবিদ্ধ পাখির মত সে আর্তনাদ করে উঠল, এ তুমি কি বলছ সুমিতা? আমি সর্বেশ্বর—সর্ব—

কঠিন নির্দয় কণ্ঠে জবাব দিল সুমিতা, তা হয় না মিঃ রায়। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

—কিন্তু কেন হয় না?

—আমাকে ভুল বুঝবেন না মিঃ রায়। ভেবে দেখুন, আপনার মেয়ে আছে। স্ত্রী আছে। আর সে এমন স্ত্রী যার জীবনে আপনার অর্থহীন স্বামীত্বই আজ একমাত্র অবলম্বন। সেই ভাগ্যহীনার জীবনের এই শেষ কানা কড়িটুকুও মেয়েমানুষ হয়ে আমি কেড়ে নেব কোন্ প্রাণে বলতে পারেন?

—এ তো শুধু তোমার দিকের কথা হল সুমিতা। কিন্তু আমার কথা কি তুমি একবারও ভাববে না? বলতে পার, আমি বেঁচে থাকব নিয়ে?

সুমিতা কৃতসংকল্প। জীবনের প্রথম প্রেমের সবুজ সহকার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তার। সেই দুঃসহ জ্বালায় জ্বলছে তার দেহ-মন। তবু বাইরে সে অটল, অচল। কিছুতেই আজ সে হার মানবে না। খেলা ভাঙাই আজ তার খেলা।

সুমিতা বলল, পৃথিবীতে সবাই স্বার্থপর মিঃ রায়। সকলেই চায় নিজেকে পূর্ণ করে তুলতে। আমিও চাই। কিন্তু ভগ্নাংশ কুড়িয়ে পূর্ণ সংখ্যার সন্ধান গণিতে মিললেও জীবনে মেলে না। তাই ভগ্নাংশে আমার লোভ নেই।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সর্বেশ্বর বলল, তাই বুঝি ব্যর্থ ভগ্নাংশের মত আমাকে ত্যাগ করতে চাও তুমি? বেশ, তাই যাও—

বাধা দিল সুমিতা, না না, আপনাকে ত্যাগ করব এমন সাধ্য

আমার কোথায় ? আমি শুধু নিজেকে সরিয়ে নিতে চাই। তার বেশি নয়।

এমন সময় বাইরে একটা আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে দুজনেই চম্‌কে কান পাতল।

রাজাবাহাদুর! রাজাবাহাদুর!

কে? কে?

ছুটে বারান্দায় গেল সর্বেশ্বর। সুমিতাও তাকে অনুসরণ করল।

বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে সর্বেশ্বরের কাছে এসে দাঁড়াল একটি বয়িয়সী স্ত্রীলোক।

তাকে চিনতে পেরেই তিরস্কার করে উঠল সর্বেশ্বর, এ কি ? স্বর্ণ-মাসি তুমি ? তোমাকে না নিষেধ করে দিয়েছিলাম কখনো পাতাল ঘর ছেড়ে উপরে আসবে না ?

স্ত্রীলোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, সর্বনাশ হয়েছে রাজাবাহাদুর, পাতাল ঘরে আগুন লেগেছে।

—সে কি ? কেমন করে লাগল ? সুনন্দা কোথায় ?

—বৌরাণীই তো আগুন লাগিয়েছে গো। খাট বিছানা সব দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর বৌরাণী সারা ঘরময় ছুটছে আর খিল্‌খিল্‌ করে শুধু হাসছে।

—আমি আসছি। বলেই হন হন করে সর্বেশ্বর হলঘরের দিকে ছুটল।

সুমিতা চেঁচিয়ে বলল, আপনি কোথায় চললেন মিঃ রায় ?

হলঘরের খোলা দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল সর্বেশ্বরের কণ্ঠস্বর, পাতাল ঘরে।

অভিমানের মুখোশ খুলে গেল সুমিতার। সে আর্তনাদ করে উঠল, ওগো তুমি যেয়ো না—যেয়ো না—

কোন জবাব এল না সে মিনতির।

এক দৌড়ে সুমিতাও হলঘরে ঢুকে পড়ল।

পাতাল ঘরের সুড়ঙ্গ পথ খোলা পড়ে রয়েছে। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়ার রাশি।

সুড়ঙ্গ পথের কাছে মুখ নামিয়ে সুমিতা প্রাণপন শক্তিতে ডাকল, সর্বেশ্বর—সর্ব—

শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়া আর কিছু বেরিয়ে এল না পাতাল ঘরের অন্ধ গুহা থেকে।

কি করবে সুমিতা ?

কেমন করে বাঁচাবে সর্বেশ্বরকে ? তার জীবনসর্বস্বকে ?

সেও কি নেমে যাবে পাতাল ঘরের পথে ?

হ্যাঁ, তাই যাবে।

সুমিতা পা নামিয়ে দিল সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকার সিঁড়িতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে পিছন থেকে আঁকড়ে ধরল দুটি স্নেহ-কোমল হাত।

চমকে ফিরে চাইল সুমিতা।

পিসিমা।

সুমিতা কেঁদে ফেলল, ও যে অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে নেমে গেল পিসিমা।

পিসিমাও কেঁদে উঠলেন, কি বললি ? ওই আগুন-লাগা পাতাল ঘরে নেমে গেছে সর্ব ? সর্বনাশ হয়েছে। ওরে গদাধর, শিগগির লোকজনকে ডাক। জল আন। সর্বকে বাঁচা।

সুমিতার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এ তুই কি করলি হতভাগী ? কেন ওকে যেতে দিলি ?

—সব দোষ আমার পিসিমা, সব দোষ আমার। আমিই ওকে ঠেলে দিয়েছি ওই অগ্নিকুণ্ডের পথে।

বলতে বলতে সুমিতা পিসিমার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

পিসিমা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁকে উঠলেন, ওরে, কাল যে তোদের বিয়ে। আজ তোরা এ কি করলি রে।

পাতাল ঘরের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে-আসা কালো ধোঁয়ার সাথে ভেসে এল একটা ভয়ানক অট্টহাসি।

পরমুহূর্তেই সেই হাসির শব্দকে ছাপিয়ে ভেসে এল একটা কাতর আর্তনাদ : উঃ মাগো।

সে শব্দ শুনে সকলেরই বুকের ভিতরটা ধ্বক ধ্বক করে কাঁপতে লাগল।।

॥ ১৩ ॥

কাল রাত্রি ভোর হল।

রাজবাড়ির ফাঁটল-ধরা ছাদের কোণে বটগাছটার পাতায় পাতায় সূর্যের প্রথম রশ্মিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই অর্ধদগ্ধ সুনন্দার জীবন-প্রদীপ নিবে গেল।

পাতাল ঘরের গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথের ধোঁয়ায় ঢাকা সিঁড়ি বেয়ে সর্বেশ্বর যখন সুনন্দার আগুনে-পোড়া বিকৃত দেহটা কাঁধে নিয়ে উঠে এল, সুনন্দার বুকের তলে প্রাণটা তখনো ধুক ধুক করছিল। অতি কষ্টে তাকে হল ঘরের খাটের উপর শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেল সর্বেশ্বর। পড়েই জ্ঞান হারাল।

ঘরের ভিতরে সবাই যেন এতক্ষণ সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল। সর্বেশ্বরকে সাহায্য করবার কথাটাও যেন কেউ ভাবতে পারে নি। ঘটনার আকস্মিকতায় দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল সবাই।

সর্বেশ্বর মুছিত হয়ে মেঝেয় পড়ে যেতেই সবাই হায় হায় করে উঠল।

বিদ্যুৎচালিতের মত এগিয়ে গেল সুমিতা। মুর্ছিত সর্বেশ্বরের মাথাটা নিজের কোলের ভিতরে তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, জল—একটু জল—

জল এল। পাখা এল। লোকজন এল। প্রাথমিক চিকিৎসা হল। রাজবাড়ির গাড়ি স্পিডোমিটারের কাঁটা কাঁপিয়ে শহর থেকে

ডাক্তার নিয়ে এল। দক্ষ নার্সের নৈপুণ্য দিয়ে সুমিতা আগলে রইল সর্বেশ্বরকে।

বেচারি সর্বেশ্বর! শরীরের জায়গায় জায়গায় আগুনের ঝল্‌সানি লেগেছে। মাথার চুল পুড়ে গেছে খানিকটা। কিন্তু সবচেয়ে বেশি পুড়েছে মুখের বাঁদিকটা। বেশ খানিকটা জায়গা একেবারে কালো হয়ে গেছে। মাঝখানটা লাল হয়ে দগ দগ করছে।

তার মুখের দিকে যেন চাওয়া যায় না। তবু সুমিতার অবাধ্য চোখ বার বার সেই বিকৃত মুখের পানেই ফিরে ফিরে চায়। যত চায় বুকের ভিতরটা ততই যেন অসহায় কান্নায় হু-হু করে ওঠে।

এমনি করে রাত কাটল। ভোর হল।

সুনন্দার নির্জীব দেহের শেষ স্পন্দনটুকু থেমে গেল।

পিসিমা নিজের গায়ের শাল দিয়ে তার প্রাণহীন দেহটাকে ঢেকে দিয়ে নীরবে চোখ মুছলেন।

চোখ মুছতে মুছতেই ফিরে এলেন সর্বেশ্বরের ঘরে।

প্রকাণ্ড মেহগেনীর খাটে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে সর্বেশ্বর। মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সারা দেহ দামী শালে ঢাকা।

শিয়রে বসে আছে অশ্রুমুখী সুমিতা। দুটি চোখ বুঝি বার বার ভরে আসছে জলে। কিন্তু চোখের জল ফেলবার সময় কোথায়? হাতে কঠোর কর্তব্য। সেবা দিয়ে যত্ন দিয়ে সর্বেশ্বরকে যে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। এই তো তার জীবনের কঠোরতম পরীক্ষা।

খাটের পাশে চেয়ারে বসে আছে ডাক্তার। নিবিষ্ট মনে বার বার পরীক্ষা করছে নাড়ি। একটার পর একটা ইনজেকসন দিচ্ছে।

পিসিমা সর্বেশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে একসময় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, ডাক্তারবাবু—

ডাক্তার বলল, আপনি মিছেই ভয় পাচ্ছেন মা, রাজাবাহাদুরের জীবনের কোন আশংকা নেই।

ডাক্তারের কথাই ঠিক হল।

সূর্যের অমৃত-আলোয় নতুন করে ভরে উঠল সর্বেশ্বরের জীবন-পাত্র।

মূর্ছা ভেঙে সে চোখ মেলে চাইল। ঘুম ভেঙে যেন জেগে উঠল এক নতুন জগতে।

মুখ দিয়ে বের হল দুর্বল কণ্ঠস্বর, পিসিমা—

পিসিমা ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে সস্নেহে বললেন, এই যে আমি সর্ব।

সর্বেশ্বর ডান হাতখানি তুলতে যেতেই সুমিতার গায়ে হাত লাগল।

মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখবার শক্তি নেই দেহে। তাই পিসিমাকেই সে জিজ্ঞেস করল, এখানে কে পিসিমা?

পিসিমা বললেন, ও যে সুমিতা। সারা রাত ও যে তোর মাথার কাছে বসে আছে।

ওঃ, বলে চোখ বুঁজল সর্বেশ্বর। একটা গভীর বেদনায় যেন বুঁজে গেল চোখের পাতা।

সুমিতার চোখ দিয়ে তখন টপ টপ করে ঝরছে অশ্রুর বিন্দু।

পিসিমা বললেন, তুমি তো এখানেই আছ মা। আমি ও ঘরে ডাক্তারবাবুকে ওর জ্ঞান হবার খবরটা দিয়ে আসি। আর সেই সঙ্গে একটু দুধও নিয়ে আসি।

পিসিমা চলে গেলেন।

আবার চোখ মেলল সর্বেশ্বর। ঘাড় ফেরাতে চেষ্টা করল। পারল না। চীৎ হয়েই সংকোচজড়িত কণ্ঠে ডাকল, সুমিতা!

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল সুমিতা, বল।

—তুমি তাহলে চলে যাও নি?

—কোথায় যাব?

এ কী বলছে সুমিতা? এ কোন্ সুধা বরিষণ? খুশির আবির ছড়িয়ে গেল সর্বেশ্বরের সারা মনে।

আবেগে কাঁপা গলায় সে বলল, তুমি তাহলে কোথাও যাবে না?

—ওগো না না, আমি কোথাও যাব না।

—তাহলে কাল যা শুনেছিলাম সে সব ভুল?

—ভুল, ভুল, সব ভুল।

—আঃ, বাঁচলাম। কী ভয়ই যে তুমি দেখিয়েছিলে কাল—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সর্বেশ্বর। কি যেন মনে পড়ে গেল বুঝি। গভীর আতংক ও উৎকণ্ঠায় কেঁপে উঠল মুখ। সাগ্রহে সে সুধাল, সুনন্দা? সুনন্দা কেমন আছে? বেঁচে আছে কি?

সুমিতা কোন জবাব দিল না। চুপ করে রইল। ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সর্বেশ্বরের মাথায়।

সর্বেশ্বর বুঝল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আপন মনেই বলল, ও বাঁচবে না আমি জানতাম। ওর শান্ত স্নিগ্ধ মনে যেদিন থেকে জ্বলে উঠেছে ব্যর্থ আক্রোশের আগুন, সেই দিনই বুঝেছি, সে আগুনে ও শুধু অন্যকেই পোড়াতে চাইবে না, নিজেও একদিন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বেচারি!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করল সর্বেশ্বর। হাত মেলে আস্তে চেপে ধরল সুমিতার হাত। ধীরে ধীরে হাতখানি বুলিয়ে দিতে গেল নিজের মুখে।

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল। গভীর হতাশায় ধীরে ধীরে বালিশের পাশে সরিয়ে রাখল সে হাত।

সুমিতা সভয়ে বলল, কি হল?

ব্যথাম্লান দুটি চোখ মেলে সর্বেশ্বর বলল, সুমিতা, আমার এই পোড়া মুখ, পোড়া শরীর, এ যে দিনের পর দিন তোমার কাছে অসহ্য—

সর্বেশ্বর কথাটা শেষ করতে পারল না। উদ্গত কান্নার স্রোতে তার কথা হারিয়ে গেল। একটা বোবা কান্নায় থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল তার দেহ।

সুমিতা অভিমানক্ষুব্ধ গলায় বলল, ছিঃ, এমন কথা তুমি ভুলেও মনে ঠাঁই দিও না। ওগো, আমি কি তোমার মুখের লাবণ্য আর গায়ের রঙটাকে চেয়েছি? আমি যে চেয়েছি তোমাকে। সেই তোমাকে যে পেয়েছি এই আমার অনেক পুণ্যের ফল।

সর্বেশ্বরের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মুখখানাকে দুই হাতে পরম মমতায় তুলে ধরল সুমিতা নিজের মুখের দিকে।

দুখানি দুর্বল হাত এসে স্পর্শ করল তাকে পরম নির্ভরতায়।

। * একটি বিদেশী উপন্যাসের কাঠামো অনুসরণে ॥